POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 44
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ২রা নভেম্বর, 2017 ১২ সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমরা কত সৌভাগ্যবান যে, তাঁহার কালাম কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসূলে অনুবর্তিতা করিয়াছি, এবং কত হতভাগ্য ঐ সকল লোক যাহারা এই ক্ষমতাধর খোদার উপর ঈমান আনে না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৮২ নং নিদর্শন: এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বারবার আমার পুস্তকসমূহে লিপিব্দ্ধ করা হইয়াছে- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّهٗ أَوَى الْقَرْيَةَ

অর্থাৎ খোদা এই প্লেগকে এই জাতি হইতে দূর করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা হৃদয়ের অবস্থান পরিবর্তন না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা স্বীয় ইচ্ছার পরিবর্তন করিবেন না। খোদা পরিণামে এই গ্রামকে স্বীয় নিরাপত্তায় লইবেন। তিনি বলেন- لَوْلَا الْإِكْرَامُ لَهَلَكَ الْمَقَامُ অর্থাৎ যদি আমি তোমার ইজ্জতের খেয়াল না করিতাম তবে এই সম্পূর্ণ গ্রামকেই ধ্বংস করিয়া দিতাম এবং তাহাদের মধ্যে একজনকেও রেহাই দেওয়া হইত না। খোদা আরও বলেন- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ এবং খোদা এইরূপ নহেন যে, তাহাদের সকলকে আযাবে ধ্বংস করিয়া দিতেন। কেননা, তুমি তাহাদের মধ্যে বসবাস কর। স্মরণ রাখা প্রয়োজন খোদা তা'লার এই বাক্য إِنَّهٗ أَوَى الْقَرْيَةَ এর অর্থ এই যে, কিছুটা শাস্তি দেওয়ার পর খোদা তা'লা এই গ্রামকে স্বীয় আশ্রয়ে লইবেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহাতে প্লেগ আসিবে না। اٰوٰى শব্দটি আরবী ভাষায় ঐ আশ্রয় দানকে বলা হয় যখন কোন ব্যক্তি এক সীমা পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকার পর শান্তিতে চলিয়া আসে, যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى অর্থাৎ খোদা তোমাকে এতীম পাইলেন এবং এতীমীর দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া আশ্রয় দিলেন। খোদা আরও বলেন, وَاٰوَيْنٰهُمَآ إِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ অর্থাৎ ইহুদীরা ঈসার ও তাঁহার মায়ের উপর যুলুম করার পর হযরত ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করিতে চাহিল। আমরা তখন ঈসা ও তাঁহার মাকে আশ্রয় দিলাম এবং তাহাদের উভয়কে এইরূপ একটি পাহাড়ে পৌঁছাইয়া দিলাম, যাহা সকল পাহাড়ের চাইতে উচ্চ ছিল, অর্থাৎ কাশ্মীরের পাহাড়। উহাতে সুস্বাদু পানি ছিল এবং উহা আরাম-আয়েশের জায়াগা ছিল। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে فَأْوٗٓا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ অর্থাৎ গুহার আশ্রয়ে চলিয়া আস। এইভাবে খোদা নিজ রহমত তোমাদের উপর বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ তোমরা যালেম বাদশাহ্‌র অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবে। মোটকথা اٰوٰى শব্দটি সর্বদা এই উপলক্ষ্যে ব্যবহার করা হয় যখন এক ব্যক্তি কোন এক সীমা পর্যন্ত বিপদাপন্ন হওয়ার পর তাহাকে শান্তিতে প্রবেশ করানো হয়। কাদিয়ান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীটি ইহাই। বস্তুতঃ একবার কিছুটা মারাত্মকভাবে কাদিয়ানে প্লেগ দেখা দিল। ইহার পর প্লেগ কমিতে লাগিল। এমনকি এই বৎসর কাদিয়ানে এক ব্যক্তিও প্লেগে মারা যায় নাই। অথচ ইহার চারিপাশে শত শত ব্যক্তি প্লেগে মরিয়া গেল।

৮৩ নং নিদর্শন: একবার আমি আমার ঐ বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ছিলাম, যাহা ছোট মসজিদ সংলগ্ন। ইহার নাম খোদা তা'লা 'বায়তুল ফিকর' রাখিয়াছেন। আমার পাশে হামেদ আলী নামে আমার এক সেবক আমার পা দাবাইতেছিল। এমন সময় আমার নিকট ইলহাম হইল, تَرٰى فَخِذًا أَلِيْمًا অর্থাৎ তুমি একটি বেদনাক্লিষ্ট উরুদেশ দেখিবে। আমি হামেদ আলিকে বলিলাম, এখন আমার উপর এই ইলহাম হইয়াছে। সে আমাকে এই উত্তর দিল যে, আপনার হাতে একটি ছোট ফোঁড়া আছে। সম্ভবতঃ ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, কোথায় হাত আর কোথায় উরুদেশ! তোমার এই ধারণা খামাকা ও অযৌক্তিক। তদুপরি ফোঁড়াতে কোন ব্যাথাও নাই। ইহা ছাড়া ইলহামের এই অর্থ যে, তুমি দেখিবে। অর্থ এই নহে যে, তুমি এখন দেখিতেছ। ইহার পর বড় মসজিদে গিয়া নামায পড়ার জন্য আমরা দুইজনেই বৈঠকখানা হইতে নামিলাম। নীচে নামিয়া দেখিলাম যে, ঘোড়ায় বসা দুই ব্যক্তি আমার দিকে আসিতেছে। দুই জনেই বিনা গদিতে দুইটি ঘোড়ার উপর বসে ছিল। দুই জনেরই বয়স ২০ বৎসরের কম ছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া সেখানেই থামিয়া গেল। তাঁহাদের একজন বলিল, অন্য ঘোড়ায় বসে থাকা ব্যক্তি আমার ভাই। সে উরুদেশের ব্যাথায় মারাত্মকভাবে পীড়িত। সে ভয়ানক অসহায়। আমরা এই জন্য আসিয়াছি যে, আপনি তাহার জন্য কোন ঔষধের পরামর্শ দিবেন। তখন আমি হামেদ আলীকে বলিলাম, আল হামদোলিল্লাহ্ আমার ইলহাম এত শীঘ্র পূর্ণ হইল যে, সিঁড়ি ইহতে নামিতে যত সময় লাগিয়াছে ইহা পূর্ণ হইতে কেবল ততখানি সময় লাগিয়াছে। শেখ হামেদ আলী এখনো জীবিত আছে। সে মওজা 'যা'র গোলাম নবী নামক স্থানের অধিবাসী। সে আজকাল আমার সহিত থাকে। কোন ব্যক্তি অন্যের জন্য নিজের ঈমান বিনষ্ট করিতে পারে না, বরং যদি মাঝখানে শিষ্যের সম্পর্ক হয় তবে ঈমান কোন মতেই বিনষ্ট করা যায় না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের শিষ্যকে এই কথা বলে যে, আমি নিজের জন্য এক মিথ্যা কেরামতি বানাইয়াছি, তুমি আমার জন্য সাক্ষ্য দাও, তাহা হইলে সে নিজের মনে নিশ্চয় বলিবে যে, এই ব্যক্তি তো এক প্রতারক এবং মন্দলোক। আমি খামাখা ইহার হাতে হাত দিয়াছি। অনুরূপভাবে এই পুস্তকে আমি যত ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছি আমার হাজার হাজার শিষ্য ঐগুলির সাক্ষী। এক অজ্ঞ বলিবে যে, শিষ্যের সাক্ষ্যের উপর কি ভরসা করা যায়? আমি বলিতেছি যে, এইরূপ সাক্ষ্যের ন্যায় অন্য কোন সাক্ষ্য হইতেই পারে না। কেননা, এই সম্পর্ক কেবল ধর্মের জন্য হইয়া থাকে। মানুষ তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যাহাকে সে নিজের বিবেচনায় পৃথিবীর সকলের চাইতে অধিক পবিত্র, খোদাভীরু ও সত্যপরায়ণ বলিয়া মনে করে। মুর্শীদের যদি এই অবস্থা হয় যে, সে শত শত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী নিজের পক্ষ হইতে বানাইয়া লইয়া শিষ্যদের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া বলেন আমার জন্য মিথ্যা বল এবং যেভাবেই হউক মিথ্যা বলিয়া আমাকে ওলী বানাইয়া দাও তাহা হইলে তাহার শিষ্যরা কীভাবে তাহাকে নেক ব্যক্তি বলিতে পারে এবং কীভাবে মনে প্রাণে তাহার সেবা করিতে পারে? তাহারা তো তাহাকে এক শয়তান বলিবে এবং তাহার উপর নারাজ হইয়া যাইবে। আমি এইরূপ শিষ্যকে অভিসম্পাত দিই, যে আমার প্রতি মিথ্যা কেরামতী আরোপ করে এবং এইরূপ মুর্শীদও অভিশপ্ত যে মিথ্যা কেরামতি বানায়।

এরপর আটের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রিপোর্টের শেষাংশ.....

জার্মান মিডিয়ার সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার

জার্মানীর প্রখ্যাত সংবাদপত্রিকা (SZ) এর সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক: আপনি আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস রাখেন। এর অর্থ কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.): অবশ্যই আমি খোদা তা'লার উপর বিশ্বাস রাখি। এর অর্থ হল এমন এক খোদার উপর ঈমান রাখি বা বিশ্বাস করি যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, যিনি আমার দোয়া শোনেন এবং সেই খোদাকে আমি আমার দোয়া গ্রহণীয়তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি সেই খোদাকে দেখেছি। বাহ্যিকভাবে নয়, কিন্তু তাঁকে দোয়ার গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে চিনেছি।

সাংবাদিক: আপনি যে খোদায় বিশ্বাস করেন এবং অন্যরা যে খোদায় বিশ্বাসী- উভয়ের খোদার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.): খোদা তো কেবল একজনই যিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-এর প্রভু-প্রতিপালক। তিনি এক-অদ্বিতীয় যিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে নবী বা অবতার প্রেরণ করেন এবং আমাদের বিশ্বাস যে প্রত্যেক জাতিতে নবী বা অবতার এসেছেন যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরীত হয়েছিলেন। এই নবী বা অবতারগণ নিজের নিজের সময়ে মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে আগমণ করেছেন।

সাংবাদিক: খলীফা শব্দ শুনে মানুষের মনে পুরনো যুগের স্মৃতি জেগে ওঠে কিম্বা দাঈশের কথা মাথায় আসে। এসম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.): খলীফা আরবী ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ হল প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী আর ইসলামের পরিভাষাতেও এটি ব্যবহৃত হয়। ভিন্নবাক্যে আমি বলব যে, ক্যাথলিক পোপকেও হযরত ঈসা (আ.)-এর খলীফা বলা হবে।

সাংবাদিক: খিলাফতের মাধ্যমে আপনারা কি অর্জন করতে চান?

হুযুর আনোয়ার (আই.): আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন যে, আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি। একটি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করার চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং দ্বিতীয়ত বান্দা বা মানুষের অধিকারের প্রতি মানুষকে সর্তক করা। যেহেতু খলীফা হলেন মসীহ ও মাহদীর প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী এই কারণে খলীফার কাজ হল সেই উদ্দেশ্য অর্জন করা।

সাংবাদিক: জার্মানীর নির্বাচনে কয়েক সপ্তাহ সময় হাতে আছে। আর এই মূহুর্তে শরণার্থী, ইসলাম এবং অভিবাসন হল প্রধান সমস্যা। অনেক আহমদীও এখানে শরণার্থী হিসেবে এসেছেন এবং খুব ভালভাবে সমন্বিত হয়ে গেছে। আপনি জার্মান রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা বা উপদেশ দিতে চান?

হুযুর আনোয়ার (আই.): জার্মান সরকার এবং জার্মানের মানুষ চিরকালই উদারমনা। এই কারণেই জার্মান সরকার একটি বিরাট সংখ্যক শরণার্থীদেরকে নিজেদের দেশে সমন্বিত করার চেষ্টা করছে। আরব হোক বা পাকিস্তানের আহমদী হোক, এই সমস্ত শরণার্থী যদি নিজেদের অঙ্গিকার রক্ষা করে চলে অর্থাৎ দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলে এবং এই দেশের নাগরিক হয়ে ওঠে তবে শরণার্থীদের কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি তারা কোন প্রকার অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয় তবে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যতদূর আহমদীদের সম্পর্ক, আহমদীরা সবসময় দেশের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে এবং যথাসম্ভব এই সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার চেষ্টা করে।

সাংবাদিক: এই মূহুর্তে জার্মানীতে যে সকল শরণার্থীরা প্রবেশ করছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কোন উপদেশ দিতে চাইবেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.):আমার উপদেশ এটিই যা আমি আহমদীদেরকেও করে থাকি যে, তারা যেন দেশের আইন শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে এবং নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে লাগায়। তারা ঐ সমস্ত মানুষের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয় যারা তাদেরকে এই দেশে থাকার সুযোগ দিয়েছে। এবং যতদূর সম্ভব এই দেশ এবং জাতির সেবা করা চেষ্টা করা। সামাজিক সহায়তা গ্রহণ করার পরিবর্তে পরিশ্রম করুন এবং অন্যদের সঙ্গে দেশ গঠনের কাজে যোগদান করুন।

সাংবাদিক: জার্মানীতে ইহুদীরাও বসবাস করে। শরণার্থীরা আসা আরম্ভ হওয়ার পর এবিষয়েও বিতর্ক হয় যে, ইহুদীরা খুব ভালভাবে জানে যে, শরণার্থী হওয়ার অর্থ কি? অপরপক্ষে , মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা দেশে প্রবেশ করছে যার ফলে মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যারা দুবৃত্তপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে আইনি পথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এই শরণার্থীদেরকে নিয়ে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাংবাদিক: আহমদী এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। এবিষয়ে আপনাদের কোন ভয় নেই?

হুযুর আনোয়ার (আই.): যদি মুসলমান শরণার্থীরা দেশের আইন রক্ষা করে চলে তবে আমার কোন ভয় নেই। আর আইন প্রয়োগ করা প্রশাসনের কর্তব্য।

সাংবাদিক: আইন প্রয়োগ করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.): এর অর্থ এটি নয়, জার্মানদের মধ্যেও কিছু মানুষ এমন আছেন যারা মুসলমান, বরং আহমদীদের বিরুদ্ধে। আমাদের কাজ হল তবলীগ বা প্রচার করা। এই কারণে আমরা যখন শান্তি , ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের বার্তা দিই তখন মানুষ নিজেরাই উপলব্ধি করে। কুরআন আমাদেরকে ভালবাসা এবং সমন্বয় সহকারে বসবাস করার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কথা বললে শত্রুও আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হবে।

সাংবাদিক: এটি একটি তাত্ত্বিক কথা, বাস্তবে তো এমনটি ঘটে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.): এটি কোন তাত্ত্বিক কথা নয়। এটি আমাদের অভিজ্ঞতায় ঘটেছে। আপনাদের জন্য হয়তো এটি তাত্ত্বিকা কথা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য নয়।

সাংবাদিক: আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে কোন আশঙ্কা নেই তো?

হুযুর আনোয়ার (আই.): আমার কাজ হল তবলীগ বা প্রচার করা। আমি যদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে ভয় পেতে থাকি তবে প্রচারের কাজ করতে পারব না। আমি অবশ্যই প্রচার করে যাব তাতে আমার জীবন সংকট দেখা দিক না কেন। পূর্বে আমি পাকিস্তানে ছিলাম। সেখানে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা আমার জীবন বেশি অসুরক্ষিত ছিল। কেননা সেখানে দেশীয় আইন দুর্বৃত্তদেরকে প্রশয় দিয়ে রেখেছে, তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে যা খুশি করতে পারে।

সাংবাদিক: মানুষ যখন ইসলামের বিষয়ে কথা বলে তখন তারা বলে যে, একটি নয় বরং কয়েক প্রকারের ইসলাম রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.): মানুষ যা খুশি বলতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এক ও অভিন্ন। একথা ঠিক যে, যেভাবে খৃষ্টধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা দল রয়েছে অনুরূপভাবে ইসলামেও একাধিক দল ও ফির্কা রয়েছে। কিন্তু সকল ফির্কার একটিই পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে এবং সকলেই বিশ্বাস করে যে, মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল। অতএব, সমস্ত ফির্কা এই বিষয়ের উপর ঈমান আনে যে, খোদা এক অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ (সা.) তাঁর নবী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামে বিভিন্ন ফির্কা বা সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলাম বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। সেই সময় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি হবেন মসীহ ও মাহদী এবং এই ব্যক্তি সমগ্র মুসলমান জাতিকে, বরং বিশ্বের সমগ্র জাতিকে এক ছত্রছায়ায় একত্রিত করবেন এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী বিস্তার লাভ করবে। এই তবলীগের কাজই আমরা বিগত একশ পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে করে চলেছি।

সাক্ষাৎকারের শেষপর্বে সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সাক্ষাৎকার পর্ব ৫টা ৫মিনিটে শেষ হয়।

এরপর (FAF) allgemeine Zeitung Duetschlandfunk রেডিও চ্যানেলের সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ভাষণে 'তথাকথিত মুসলিম' (So called Muslims) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: (So called Muslims বলতে সেই সমস্ত মুসলমান যারা কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করছে না, কেবল মুসলমান হওয়ার দাবী করে, কিন্তু তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। এই কারণে আমি তাদেরকে নামসর্বস্ব মুসলমান বলে উল্লেখ করেছিলাম। তারা এই সব অপকর্ম ইসলামের নামে করছে। ইসলাম তো শান্তির শিক্ষা দেয়। অতএব যারা ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং অত্যাচার করছে, অথচ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছে তাদের সম্পর্কে আমি বলব তারা প্রকৃত মুসলমান নয় বরং নামধারী মুসলমান, কেননা তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

*সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: এই নামধারী মুসলমানরা কি ইসলামের জন্য বিপদ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শেষ যুগে মুসলমানদের অবস্থা এরূপ হবে যে, ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেই সময় একজন সংস্কারকের আবির্ভাব হবে যিনি ইসলামের পয়গম্বার (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্যকারী হবেন এবং তিনি ছায়া নবী হওয়ার দাবী করবেন। তাঁকে মসীহ এবং মাহদীর উপাধি দেওয়া হবে। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করবেন যা সেই সময়ের উলেমা ও পন্ডিতবর্গ ভুলে বসবে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে,

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজকে যুক্তরাজ্য মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আমি আনসার সদস্যদেরকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হল নামায।

সব মু'মিনের জন্য এটি ফরয বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব কিন্তু জীবনের চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এই চেতনা পূর্বের চেয়ে আরো দৃঢ় হওয়া উচিত যে, আমার বয়স যতই বাড়ছে ততই আমার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে খোদার ইবাদত এবং নামাযের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা, সে সময় খুব দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে যখন আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে হবে আর সেখানে আমার প্রতিটি কর্মের হিসাব হবে।

আল্লাহ্ তা'লা নামাযের প্রতি যখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন যেন নামায নিয়মিত পড়া হয় আর সব নামায সময়মতো এবং বাজামা'ত পড়া হয়। নামায কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে আর নামায কায়েম করার অর্থই হল, যথাসময়ে জামা'তের সাথে নামায পড়া।

আনসারুল্লাহকে বিশেষভাবে এই কথার প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, তাদের সকল সদস্য যেন রীতিমত বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত হয় বরং প্রত্যেক নাসেরকেই এটি খতিয়ে দেখতে হবে আর চেষ্টা করা উচিত সে যেন বাজামা'ত নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়। অসুস্থতা বা কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া বাজামা'ত নামায পড়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। কাছাকাছি কোন মসজিদ বা নামায সেন্টার না থাকলে সেই এলাকার আহমদীরা একত্রিত হয়ে কোন ঘরে জামা'তবদ্ধভাবে নামায পড়তে পারে। এই সুবিধাও যদি না থাকে তাহলে ঘরের সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে জামা'তের সাথে নামায পড়া উচিত। এর ফলে শিশুদের এবং যুবকদের মধ্যে নামাযের পাশাপাশি বাজামা'ত নামায পড়ার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

আনসারুল্লাহ সত্যিকার অর্থে তখনই আনসারুল্লাহ্ বলে পরিগণিত হতে পারে যখন তারা খোদার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এবং সে অনুসারে নিজেরা আমল করতে ও অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে ভূমিকা পালন করবে। খোদার ইবাদত যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য যদি অর্জিত না হয় আর যাদেরকে এর জন্য তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের দ্বারা কাজ না করানো হয় বা কাজ করানোর চেষ্টা না করা হয় অথবা উত্তম আদর্শ স্থাপন না করা হয় তাহলে কেবল নামের আনসারুল্লাহ হবে।

প্রত্যেক নাসেরের এ আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সে নামাযে কতটা নিয়মিতএবং সন্তান-সন্ততির সামনে কতটা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে আর তাদের নামাযের অবস্থা ও চিত্র কেমন? নামাযকে শুধু একটি বোঝা হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, নাকি খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমরা এসব করছি?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের গুরুত্ব, এর আবশ্যিকতা,নিগূঢ় তত্ত্ব, পড়ার রীতি, উদ্দেশ্য, দর্শন এবং নামাযের সময়ের যৌক্তিকতা মোটকথা এ বিষয়টি সম্পর্কে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কিছু উক্তি এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যা এর গুরুত্ব ও নিগূঢ় তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৯ তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজকে যুক্তরাজ্য মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আমি আনসার সদস্যদেরকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হল নামায। সব মু'মিনের জন্য এটি ফরয বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব কিন্তু জীবনের চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এই চেতনা পূর্বের চেয়ে আরো দৃঢ় হওয়া উচিত যে, আমার বয়স যতই বাড়ছে ততই আমার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে খোদার ইবাদত এবং নামাযের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা, সে সময় খুব দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে যখন আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে হবে আর সেখানে আমার প্রতিটি কর্মের হিসাব হবে। অতএব, এমন পরিস্থিতিতে একজন মু'মিনের এবং মৃত্যুর পরের জীবন ও শেষ-দিবসে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তির এই চিন্তা থাকা উচিত যে, আমরা যেন খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদানও নিশ্চিত করি আর বান্দাদের অধিকার প্রদানও নিশ্চিত করি আর সাধ্য অনুসারে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে উপনীত হই।

আল্লাহ্ তা'লা নামাযের প্রতি যখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন যেন নামায নিয়মিত পড়া হয় আর সব নামায সময়মতো এবং বাজামা'ত পড়া হয়। নামায কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে আর নামায কায়েম করার অর্থই হল, যথাসময়ে জামা'তের সাথে নামায পড়া। কিন্তু দেখা গেছে যে, যদিও আনসারগণ বয়সের দিক পরিপক্কতা অর্জন করে আনসারে উপনীত হয়েছেন যখন সমস্ত বিষয়কে গম্ভীরভাবে নেয়, তথাপি বাজামা'ত নামায পড়ার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি নেই যেভাবে থাকা উচিত। হয়তো আনসারুল্লাহও তাদের রিপোর্টের সমীক্ষা করেছে এবং করাও উচিত। তাই আনসারুল্লাহকে বিশেষভাবে এই কথার প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, তাদের সকল সদস্য যেন রীতিমত বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত হয় বরং প্রত্যেক নাসেরকেই এটি খতিয়ে দেখতে হবে আর চেষ্টা করা উচিত সে যেন বাজামা'ত নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়। অসুস্থতা বা কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া বাজামা'ত নামায পড়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। কাছাকাছি কোন মসজিদ বা নামায সেন্টার না থাকলে সেই এলাকার আহমদীরা একত্রিত হয়ে কোন ঘরে জামা'তবদ্ধভাবে নামায পড়তে পারে। এই সুবিধাও যদি না থাকে তাহলে ঘরের সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে জামা'তের সাথে নামায পড়া উচিত। এর ফলে শিশুদের এবং যুবকদের মধ্যে নামাযের পাশাপাশি বাজামা'ত নামায পড়ার সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

অতএব, আনসারুল্লাহ সত্যিকার অর্থে তখনই আনসারুল্লাহ্ বলে

পরিগণিত হতে পারে যখন তারা খোদার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এবং সে অনুসারে নিজেরা আমল করতে ও অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে ভূমিকা পালন করবে। খোদার ইবাদত যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য যদি অর্জিত না হয় আর যাদেরকে এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের দ্বারা কাজ না করানো হয় বা কাজ করানোর চেষ্টা না করা হয় অথবা উত্তম আদর্শ স্থাপন না করা হয় তাহলে কেবল নামের আনসারুল্লাহ হবে। আজকে আমরা তরবারি ও তীরের যুদ্ধ লড়ছি না, যেখানে সাহায্যকারীর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমাদের বিজয় লাভের একমাত্র অস্ত্র হল দোয়া (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮)। তাই আনসারুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী পরিগণিত হওয়ার জন্য দোয়ার এ অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য আবশ্যক খোদা নির্দেশিত রীতি অনুসারে এই অস্ত্র ব্যবহার করা। আর এটি যদি করা হয় কেবল তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি সঠিক অর্থে পুরণকারী হিসেবে গণ্য হব। অন্যথায় তিনি বারবার স্মরণ করিয়েছেন যে, আমার কথা যদি না মান আর নিজেদের মধ্যে যদি পবিত্র পরিবর্তন না আন এবং নিজের ইবাদতের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন না কর তাহলে আমার হাতে বয়আত করার কোন অর্থ নেই (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:১৪০)।

তাই প্রত্যেক নাসেরের এ আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সে নামাযে কতটা নিয়মিতএবং সন্তান-সন্ততির সামনে কতটা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে আর তাদের নামাযের অবস্থা ও চিত্র কেমন? নামাযকে শুধু একটি বোঝা হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, নাকি খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমরা এসব করছি?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের গুরুত্ব, এর আবশ্যিকতা,নিগূঢ় তত্ত্ব, পড়ার রীতি, উদ্দেশ্য, দর্শন এবং নামাযের সময়ের যৌক্তিকতা মোটকথা এ বিষয়টি সম্পর্কে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কিছু উক্তি এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যা এর গুরুত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করে।

নিয়মিত ও যথাযথভাবে নামায পড়া সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এক বৈঠকে বলেন-

"নিয়মিত যথাসময়ে নামায পড়। অনেকেই এমন আছে যারা কেবল একবেলার নামায পড়ে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, নামায কখনো মাফ হয় না। এমনকি নবীদের নামাযও ক্ষমা করা হয় নি। এক হাদীসে আছে রসুলুল্লাহ (সা.) -এর কাছে নতুন একটি জামা'ত এসে নামায না পড়ার অনুমতি চায়। এতে তিনি (সা.) বলেন, 'যে ধর্মে আমল বা অনুশীলন নেই সেটি ধর্মই নয়।' তাই এ কথাটি তোমরা ভালোভাবে স্মরণ রেখো এবং খোদার নির্দেশ অনুসারে কাজ কর। আল্লাহ্ বলেন যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি হল, আকাশ ও এ পৃথিবী তাঁর আদেশে স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।" আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলেই আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে অন্যথায় নয়। তিনি (আ.) বলেন- " অনেক সময় এমন মানুষ যারা প্রকৃতি পূজারী তারা বলে যে, প্রকৃতি পূজার ধর্মই অনুসরণযোগ্য। কেননা, স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি অনুসরণ করা না হলে খোদাভীতি ও পবিত্রতার কীমূল্য রয়েছে?(মানুষ তাদের নিজেদের ইচ্ছামত দর্শন বানিয়ে রেখেছে।) তিনি (আ.) বলেন– অতএব, স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, খোদা তা'লার নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি নিদর্শন হল, অনেক সময় ঔষধও ব্যর্থ হয় আর স্বাস্থ্য রক্ষার যাবতীয় বিধি ও উপকরণ কোন কাজে আসে না। ঔষধও কাজে আসে না আর দক্ষ চিকিৎসকও কোন কাজে আসে না, কিন্তু যদি খোদার ইচ্ছা থাকে তাহলে উল্টোও সোজা হয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৩)

তাই এর জন্য আবশ্যক হল খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আর এর সর্বত্তোম উপায় হল তাঁর ইবাদত এবং ইবাদতের মাঝে নামায পড়া অন্যতম।

পুনরায় নামাযের মর্ম, গুরুত্ব, মানুষের নামায পড়ার প্রয়োজনীয়তা এবং নামাযের সময় মানুষের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"নামায কী? একটি বিশেষ দোয়া কিন্তু মানুষ এটিকে রাজা-বাদশাহর কর মনে করে। নির্বোধ এতটা বুঝে না যে, খোদা তা'লার এমন বিষয়ের কী প্রয়োজন? মানুষ দোয়া,তাসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা) ও তাহলীলে (একত্ববাদ ঘোষণা) রত থাকুক- সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর সত্তার এ বিষয়ের কী প্রয়োজন? বস্তুত, এতে মানুষের নিজের কল্যাণই নিহিত। কেননা, এভাবে সে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করে নেয়, (নামাযের মাধ্যমে তার অভাব মোচন হয়, তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হয়, তার লক্ষ্য অর্জিত হয়) তিনি (আ.) বলেন, এটি দেখে আমার খুব আফসোস হয় যে, আজকাল ইবাদত, তাকওয়া এবং ধার্মিকতার প্রতি ভালোবাসা নেই। এর কারণ হল, বিভিন্ন কুপ্রথার সার্বজনীন বিষময় প্রভাব। এ কারণেই খোদা তা'লার ভালোবাসা নিরুত্তাপ হচ্ছে এবং ইবাদত যেমন উপভোগ্য হওয়ার কথা ছিল তেমন উপভোগ্য হয় না। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ ও বিশেষ এক আনন্দ অন্তর্নিহিত রাখেন নি। (সব জিনিসের মাঝেই এটি রয়েছে এবং মানুষ এক বিশেষ স্বাদ বা আনন্দ উপভোগ করে) এক রোগী যেভাবে এক উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পায় না, সেটিকে তীক্ত বা স্বাদহীন মনে করে। (রোগীদের জিহ্বার স্বাদ হারিয়ে যায়, তারা কোন কিছুরই স্বাদ পায় না। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা এটি দেখতে পাই।) তিনি (আ.) বলেন- অনুরূপভাবে, যারা খোদার ইবাদতে আনন্দ ও স্বাদ পায় না, এমন মানুষের নিজেদের ব্যাধি সম্পর্কে চিন্তিত হওয়া উচিত। (এর অর্থ হল, যারা নিজেদের নামাযে স্বাদ পায় না তারাও অসুস্থ।) কেননা,যেভাবে আমি বলেছি, এ পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা কোন প্রকার স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখেন নি। আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, কী কারণে এই ইবাদত তার জন্য আনন্দের ও উপভোগ্য হবে না? স্বাদ এবং আনন্দ তো অবশ্যই আছে কিন্তু তা উপভোগ করার মত মানুষও থাকা চাই। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আযযারিয়াত : ৫৭) যেখানে মানুষ সৃষ্টিই হয়েছে ইবাদতের জন্য তখন ইবাদতে এক পরম মার্গের আনন্দ এবং স্বাদও রাখা হয়েছে (ইবাদতে চরম আনন্দ থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি অনর্থক ও কল্যাণহীন বলে প্রতিপন্ন হবে। যদি আনন্দই না পায়, স্বাদ না পায় তাহলে কীভাবে মানুষ সে কাজ করতে পারে?) তিনি (আ.) বলেন, আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এটি লক্ষ্য করি এবং খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করি। উদাহণস্বরূপ দেখ! খাদ্যশস্য এবং সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য মানুষের জন্য সৃষ্ট। (পানাহারের সকল জিনিসই মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।) সে কি এগুলোর মাঝে স্বাদ ও আনন্দ পায় না? এই স্বাদ ও আস্বাদনের জন্য কি তার মুখে জিহ্বা নেই? উদ্ভিদ হোক বা জড়বস্তু, (গাছপালা , পাহাড়, ফল-ফুল বা সুন্দর সুন্দর জিনিস হোক) বিভিন্ন প্রাণী হোক বা মানুষ প্রভৃতি সুন্দর বস্তু দেখে কি সে আনন্দিত হয় না? তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ে পুলক জাগানো এবং মধুর সুরে কি তার কান মোহিত হয় না? একথা প্রমাণের জন্য আরো কোন যুক্তিপ্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, ইবাদতে কোন স্বাদ আছে। তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন– নর-নারীকে আমরা জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি আর পুরুষদের মধ্যে (নারীদের প্রতি) আকর্ষণ রেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা এখানে জোর করেন নি বরং এতে এক আনন্দ ও স্বাদ রেখেছেন। কেবল সন্তান-সন্ততি এবং বংশ-বিস্তারই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হত না। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও এক স্বাদ ও আনন্দ নিহিত আছে আর এই স্বাদ ও আনন্দ পৃথিবীর সকল প্রকার স্বাদ এবং প্রবৃত্তির সকল সুখ ও আনন্দ হতে উৎকৃষ্টতর। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে এক রোগী খুবই সুস্বাদুখাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে একইভাবে হ্যাঁ! ঠিক এভাবেই সেই মানুষও দুর্ভাগা যে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকে উপভোগ করে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬০)

অতএব, নামাযে স্বাদ না পাওয়া, নামাযের প্রতি মনোযোগী না হওয়া এবং আল্লাহ্‌র কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানুষের দুর্বলতাকেই চিহ্নিত করে। অতএব, আমাদের মাঝে যারাই এমন আছে তাদের চিন্তা করা উচিত।

প্রকৃত নামায কেমন আর কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"স্মরণ রেখো! নামায এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই সুন্দর ও সুসজ্জিত হয় কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এমনভাবে নামায পড়ে যে, নামায তাদেরকে অভিশাপ দেয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (আল-মাউন: ৫-৬) অর্থাৎ, ধ্বংস সেই সব নামাযিদের জন্য যারা নামাযের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি (আ.) বলেন, নামায সেই ইবাদত, যা পড়লে মানুষকে সকল প্রকার অসৎ কর্ম এবং নির্লজ্জতা থেকে তাকে রক্ষা করা হয়..... । এভাবে নামায পড়া মানুষের নিজের শক্তিবলে সম্ভব নয়। খোদার সাহায্য এবং খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া এটি অর্জিত হতে পারে না। মানুষ যতদিন না দোয়ায় রত থাকবে, হৃদয়ে এমন ধরণের বিগলন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। (নামায পড়ার জন্য এবং এই মর্যাদা অর্জনের জন্য মানুষকে একদিকে যেমন সকল পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে তেমনি অপরদিকে

খোদার কৃপাভাজন হওয়া এবং হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যক।) তিনি বলেন, "তাই দিন হোক বা রাত, বস্তুতঃ তোমাদের কোন একটি মুহূর্তও যেন দোয়া শূন্য না থাকে। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭)

অতএব, নামাযের স্বাদ পাওয়ার জন্য এবং একে উপভোগ্য করে তোলার জন্য খোদার কৃপাভাজন হতে হবে আর খোদার কৃপা লাভের জন্য আবার তাঁর সামনেই বিনীত হতে হবে এবং চলাফেরায় সময়ও তাঁক স্মরণ করতে হবে আর হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টির জন্য দোয়া করতে হবে। মানুষ এ অবস্থা সৃষ্টি করলে নামাযও তখন উপভোগ্য হয়ে উঠে।

নামাযে স্বাদ না পাওয়ার কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন-

" আমি দেখি যে, নামাযের প্রতি মানুষ উদাসীন, এবং এবিষয়ে তারা আলস্য প্রদর্শণ করে, কারণ তারা সেই স্বাদ ও আনন্দ সম্পর্কে অজ্ঞ, যা আল্লাহ্ তা'লা নামাযের মাঝে রেখেছেন আর এর মূল কারণ এটিই। এছাড়া শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারীদের মধ্যে আলস্য আরো বেশি দেখা যায়। (যারা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে ব্যস্ততা থাকে তারা কাজের কারণে আরো বেশি উদাসীন হয়ে যায়।) তিনি (আ.) বলেন, পঞ্চাশ ভাগের একভাগ মানুষও সম্পূর্ণ মনোযোগ ও প্রকৃত ভালোবাসা নিয়ে তাদের সত্যিকার প্রভূর সামনে সেজদাবনত হয় না। পুনরায় প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এই স্বাদ সম্পর্কে কেন তারা অজ্ঞ আর এ স্বাদ তারা কখনো কেন পায় নি? (অন্যান্য ধর্মে রীতিমত ইবাদতের এ ধরনের নির্দেশ নেই) কোন কোন সময় এমন হয় যে, আমরা কাজে ব্যস্ত থাকি আর মুয়াজ্জিন আযান দেয়, মানুষ তা শোনাও পছন্দ করে না মনে হয় যেন তাদের মনে কষ্ট লাগে। এমন মানুষ সত্যিই করুণার পাত্র। (আযান হয় কিন্তু আযানের প্রতি কর্ণপাত করে না অথবা নামাযের সময় হয় তথাপি সেদিকে মনোযোগ দেয় না) তিনি (আ.) বলেন, এদের অবস্থা সত্যিই করুণ। তিনি(আ.) বলেন, এখানেও কিছু মানুষ এমন রয়েছেন মসজিদের নিচে যাদের দোকান রয়েছে কিন্তু কখনো গিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় না"। (অর্থাৎ, নামাযের জন্য যায় না।) তিনি (আ.) বলেন– অতএব, আমি বলতে চাই, অন্তরে এক ব্যকুলতা নিয়ে গভীর উচ্ছ্বাস ও আকুলতার সাথে আল্লাহর কাছে এই দোয়া করা উচিত যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ফল-ফলাদি এবং অন্যান্য বস্তুর মাঝে নানান ধরণের স্বাদ অন্তর্নিহিত রেখেছেন অনুরূপে তিনি যেন নামায এবং ইবাদতেরও একবার স্বাদ পাইয়ে দেন। মানুষ যা খায় তা মনে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন কোন সুন্দর মানুষকে মুগ্ধ হয়ে দেখে তখন তাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখে আর যদি কোন কুৎসিত বা অপছন্দনীয় চেহারা দেখে তবে তার পুরো অবস্থা তার সামনে মূর্ত হয়। অবশ্য কখনো যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে মানুষের কিছুই মনে থাকে না। (সুন্দর বা কুৎসিত জিনিস এজন্য মনে থাকে যে, মনোযোগসহকারে তা দেখে কিন্তু যদি কোন সংস্রব না থাকে তাহলে তার কিছুই মনে থাকে না।) অনুরূপভাবে বে-নামাযীদের দৃষ্টিতে নামায হল একটি জরিমানা। অনর্থক সকাল বেলা উঠে শীতের মধ্যে ওজু করে আরামদায়ক নিদ্রা পরিহার করে বেশ কয়েক প্রকার আরাম আয়েশ ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তে হয়। আসল কথা হল, এর প্রতি তাদের হৃদয়ে এক উদাসীনতা রয়েছে। এমন মানুষ নামাযকে বুঝে না। নামাযে যে আনন্দ এবং স্বাদ রয়েছে সে সম্পর্কে সে অবগত নয়। (জানেই না বা বুঝেই না যে, নামাযে কী স্বাদ এবং আনন্দ নিহিত আছে।) তিনি (আ.) বলেন, নামাযের এই আনন্দ বা স্বাদ কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে? আমি দেখি যে, এক মদ্যপ ও নেশাসক্ত ব্যক্তি নেশা না হওয়া পর্যন্ত সে উপুর্যপুরি পান করতে থাকে, এক পর্যায়ে সে একপ্রকার নেশা বোধ করে। বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবানরা এই উদাহরণকে কাজে লাগাতে পারে। আর তা হল, সে যেন নামাযে অবিচল এবং স্থায়ী হয়। (যথারীতি নামায পড়া উচিত এবং যতদিন স্বাদ না পায় নামায পড়ে যাওয়া উচিত, আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া উচিত যে, হে আল্লাহ্! নামাযে সেই আনন্দ দাও, সেই স্বাদ দাও যা অন্যান্য বস্তুতে তুমি অন্তর্নিহিত রেখেছ।) তিনি (আ.) বলেন, সে যেন এতে স্থায়ীত্ব অবলম্বন করে এবং রীতিমত নামায পড়তে থাকে, অবশেষে সে স্বাদ পেয়ে যাবে। আর যেভাবে এক মদ্যপ ব্যক্তির মাথায় এক কল্পিত স্বাদ থাকে যা অর্জন করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মন-মস্তিষ্কে এবং সকল শক্তিবৃত্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত নামাযে সেই স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা। (মানুষের যত শক্তি ও সামর্থ্য আছে সেগুলোকে এ কাজে নিয়োজিত করা উচিত যে, আমাকে নামাযে স্বাদ পেতে হবে। নামায উপভোগ করতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, সেই তৃপ্তি ও আনন্দ লাভের জন্য অন্ততপক্ষে এই নেশাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যকুলতা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে হৃদয় থেকে যেন এক দোয়া উদ্ভুত হয়। তিনি (আ.) বলেন, এই স্বাদ পাওয়ার জন্য যদি এমন ব্যকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়, তবে আমি সত্যি সত্যি বলছি যে, অবশ্য অবশ্যই সেই স্বাদ লাভ হবে। তিনি (আ.) বলেন, নামায পড়ার সময় সেই সকল স্বার্থও যেন অর্জন করে যা এর দ্বারা লাভ হয় আর এহসান বা নেককর্ম যেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (সূরা হুদ: ১১৫) অর্থাৎ, পুণ্য পাপকে দূরীভূত করে। অতএব, এ সকল পুণ্য এবং আনন্দ হৃদয়ে রেখে দোয়া করুন যে সেই নামাযের সৌভাগ্য হয় যা সত্যবাদীদের এবং নেককর্মশীলদের নামায হয়ে থাকে। এই যে বলা হয়েছে إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (সূরা হুদ: ১১৫) অর্থাৎ পুণ্য অর্থাৎ নামায পাপকে দূরীভূত করে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায অশ্লীলতা, অন্যায় ও পাপ থেকে রক্ষা করে, কিন্তু আমরা দেখি যে অনেকেই নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপে লিপ্ত থাকে। এর উত্তর হল–তারা নামায পড়ে কিন্তু সত্যিকার স্পৃহা এবং সততার সাথে পড়ে না। তাদের নামাযে কোন সারবত্তা থাকে না।) তারা কেবল প্রথাগতভাবে অভ্যাস জনিতভাবে সেজদা করে, তাদের হৃদয় মৃত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই নামাযের নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেন নি, যেখানে 'হাসানাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন আর 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করেন নি অথচ অর্থ একই। এর কারণ হল- নামাযের বৈশিষ্ট্য আর সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করা যে, সেই নামাযই পাপ দূরিভূত করে যার মাঝে সত্য, নিষ্ঠা এবং সত্যের প্রেরণা থাকে এবং কল্যাণের বৈশিষ্ট্য যেন তাতে থাকে। এমন নামায অবশ্যই পাপকে দূরিভূত করে। নামায কেবল উঠা বসার নাম নয়, নামাযের প্রাণ এবং সারবত্তা হল সেই দোয়া যা নিজের মাঝে এক স্বাদ এক আনন্দ রাখে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২)

নামাযের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা কীভাবে করা উচিত? নামাযের যে বিভিন্ন 'রুকন' বা অংশ রয়েছে অর্থাৎ দাঁড়ানো, রুকু করা, সেজদা করা, দুই সেজদার মাঝখানে বসা বা দুই রাকাতের পর বসা এগুলো নামাযের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল সেই লক্ষ্য ও সারবত্তা অর্জন করা।

এসম্পকে তিনি (আ.) বলেন: 'নামাযের যে বিভিন্ন 'রুকন' বা অংশ রয়েছে আসলে এগুলো আধ্যাত্মিক অর্থে উঠা বা বসারই নাম। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার মুখোমুখি দণ্ডায়মান হতে হয়। কিয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়াও সেবকদেরই শিষ্টাচার বা সেবকসুলভ বৈশিষ্ট্যেরই বহি:প্রকাশ। (মানুষ যখন বড় মানুষের কাছে যায় তখন শ্রদ্ধার সাথে দণ্ডায়মান থাকে। অতএব, নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া এটি সেবকসুলভ শিষ্টাচারেরই পরিচায়ক।) রুকু হল দ্বিতীয় অংশ যার দ্বারা মানুষ এটি বলে যে, সে নির্দেশ পালনের জন্য কতটা নতজানু হয়ে প্রস্তুত থাকে। আর সেজদা পরম শিষ্টাচার আর বিনয় আর বিলুপ্তিকে প্রকাশ করে, যা ইবাদতের উদ্দেশ্য। (মানুষ যখন সেজদা করে তখন সে নিজেকে পরম বিনয়ের সাথে আত্মবিলুপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যায়, এটিই ইবাদতের উদ্দেশ্য যে আমি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হচ্ছি) আল্লাহ্ তা'লা এই শিষ্টাচার ও রীতি প্রতীকি (স্মরণ) হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর দেহকে আধ্যাত্মিক উঠাবসা থেকে বরকত বা অংশ দেয়ার জন্য এগুলো নির্ধারণ করেছেন। (যেভাবে বাহ্যতঃ মানুষ শিষ্টাচার প্রদর্শন করছে একইভাবে আধ্যাত্মিকভাবেও আত্মা এবং হৃদয়কেও শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হবে, কিয়াম, রুকু, আর সেজদা করতে হবে।) এছাড়া আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রমাণস্বরূপ একটা বাহ্যিক অবস্থাও রেখেছেন। যদি বাহ্যিক অবস্থায় (যা আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক অবস্থারই প্রতিফলন) একজন অনুকরণকারীর মত শুধু অনুকরণই করা হয়, (শুধু হাত বাঁধা, উঠা, রুকুতে যাওয়া, বসা, এইসব যদি অনুকরণকারীর মত অনুরকরণই করতে হয়) আর এটিকে ভারী বোঝা মনে করে ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় তাহলে তুমি নিজেই চিন্তা কর যে, এটি মানুষ কীভাবে উপভোগ করতে পারে? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বাদ না পাবে, উপভোগ না করবে এর প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম কীভাবে সে হৃদয়াঙ্গম করবে? (স্বাদ বা আনন্দ না পেলে নামাযের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম বুঝে ওঠা সম্ভব নয়) এটি তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ও সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলুপ্তি এবং পূর্ণ বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে পড়ে। (অতএব, আত্মাকেও সেভাবেই সেজদা করতে হবে যেভাবে দেহ সেজদা করে। আল্লাহ তা'লার সামনে সেভাবে বিনত হওয়া উচিত যেভাবে দেহ সেজদাবনত হয়।) আর মুখ যা বলে আত্মাও যখন তাই উচ্চারণ করে। (যে শব্দগুলি মুখ থেকে বের হয় তা যেন হৃদয়ের গভীর থেকে উদ্ভুত হয়) তখন এক প্রশান্তির জ্যোতিঃ এবং এক আনন্দ লাভ হয়। আমি এটিকে আরো বিশদে বর্ণনা করে লিখতে চাই যে, মানুষ যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে মানুষে পরিণত হয়, যেমন- শুক্রানু বরং তারও পূর্বে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য এবং সেগুলোর গঠন এবং এরপর শুক্রানুর পর বিভিন্ন

পর্যায় অতিক্রম করে শিশু জন্ম নেয়। এরপর যৌবন ও বার্ধক্যে উপনীত হয়। মোটকথা বিভিন্ন সময়ে অতিক্রান্ত এই সকল অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার 'রবুবিয়ত' বা প্রতিপালনের কথা সব সময় যদি স্বীকার করে এবং সেই চিত্র সব তার মন-মস্তিষ্কে চিত্রিত থাকে তবে সে আল্লাহ্ তা'লাকে 'রব্ব' বা প্রতিপালক জ্ঞান করে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করবে।" (মানুষ যদি এসব কিছু নিয়ে চিন্তা করে যে আমি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছি, কীভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছি, কীভাবে বড় হয়েছি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে লালন-পালন করেছেন, কেবল তবেই সত্যিকার অর্থে বান্দা বা দাস হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথা মানুষ ভাবতে পারে এবং পালন করতে পারে।) বস্তত:আমার বক্তব্যের মোদ্দাকথা হল নামাযে তৃপ্তি এবং আনন্দ বান্দা এবং প্রভুর এক সম্পর্কের কল্যাণে সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীনতার পর্যায়ে না পৌঁছে দিবে যা 'রবুবিয়্যত'-এর প্রকৃত দাবি পূর্ণ করবে (অর্থাৎ নিজেকে অর্থহীন, গুরুত্বহীন যতক্ষণ মনে না করবে) ঐশী কল্যাণরাজী এবং খোদা তা'লার প্রতিফলন তার ওপর হয় না। (খোদার কল্যাণ থেকে যদি লাভবান হতে হয় পুর্ণ দাসত্ব বরণ করতে হবে।) যদি এমনটি হয় তাহলে উন্নতমানের আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ হয় যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন স্বাদ বা আনন্দ থাকতে পারে না। এ স্তরে এসে মানুষের আত্মা বা রূহ যখন সম্পূর্ণভাবে বিলীনতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সে খোদা তা'লার দিকে এক প্রস্রবণের মত প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার সাথে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। তখন খোদার ভালোবাসা তার ওপর বর্ষিত হয়। এই মিলনের সময় এই দু'টি উচ্ছ্বাস- ওপর থেকে খোদা তা'লার (বান্দার প্রতি ভালবাসার) উচ্ছ্বাস এবং নীচে থেকে বান্দাদের দাসত্বের উদ্দীপনার ফলে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। (এমন সম্পর্ক যখন সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা রবুবিয়্যাত বা প্রতিপালনের গুণ উদ্বেলিত হয় এবং মানুষের খোদা তা'লার রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্যে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মানুষের উবুদিয়্যত বা দাসত্বের এক উদ্দীপনা এবং আগ্রহ দেখা যায় এবং উভয়ের যখন মিলন ঘটে তখন এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হয়, আধ্যাত্মিক স্বাদ সৃষ্টি হয়। এর নাম হল সালাত।" (এই বিশেষ অবস্থার নাম নামায, যা রব্ব এবং দাসের মিলনে সৃষ্টি হয়) এই হল সেই নামায যা পাপকে ভস্মিভূত করে (আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি এমন নামায হয় তবেই তা পাপকে দূরীভুত করে এবং ভস্মিভুত করে) এবং নিজের জায়গায় এক জ্যোতিঃ ও দীপ্তি রেখে যায় যা পুণ্যের পথের পথিকের কাছে বিপদ ও সংকটের সময় উজ্জ্বল প্রদীপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর পথে আসা সকল প্রকার খড় কুটো, কাঁটা এবং পাথর- যা হোঁচটের কারণ হয় তা সম্পর্কে অবহিত করে তাকে রক্ষা করে। (সে সমস্ত পাপ তার চোখে পড়ে) আর এ অবস্থাতেই إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (আল-আনকাবুত: ৪৬) তার ক্ষেত্রে প্রযোয্য হয়। কেননা, তার হাতে নয় বরং হৃদয়ে এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ থাকে। (তিনি বলছেন যে, এই অবস্থাই إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ(সূরা আনকাবুত : ৪৫) তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ নামায অশ্লীলতা এবং পাপ থেকে এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে, তার হৃদয়ে এক উজ্জ্বল প্রদীপ বিরাজমান থাকে) আর এই অবস্থা পূর্ণ বিনয়, আত্মবিলীনতা এবং পূর্ণ আনুগত্যের ফলে লাভ হয়। এমতাবস্থায় পাপের চিন্তা মাথায় কীভাবে আসতে পারে? (এমন অবস্থা যদি লাভ হয় পাপের কথা সে ভাবতেই পারে না) আর অস্বীকার করার কথা সে ভাবতেই পারে না। অশ্লীলতার দিকে তার দৃষ্টি যেতেই পারে না। বস্তত এমন একটি আনন্দ আর এমন একটি স্বাদ সে লাভ করে যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৪-১৬৬)

এক আত্মাভিমানী মু'মিন সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহ্‌র সামনেই নতজানু হয় এবং হওয়া উচিত আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে কোনভাবে নিজেদের আশা-আকাঙ্খা এবং মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা উচিত নয়।এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

"এই কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, নামায যা সত্যিকার অর্থে নামায তা দোয়ার ফলেই লাভ হয় (নামাযও দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হওয়া সম্ভব।) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা মু'মিন সুলভ বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী; প্রার্থনার এই মর্যাদা কেবল আল্লাহ্ তা'লারই প্রাপ্য। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিজেকে তুচ্ছ প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র কাছে যাচনা না করবে, তাঁর কাছে না চাইবে, নিশ্চিত জেনে রেখো, এমন ব্যক্তি সত্যিকার মুসলমান এবং মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের সত্যিকার মর্ম এবং অর্থ হল বাহ্যিক হোক বা আভ্যন্তরীণ মানুষের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারেই যেন সমর্পিত হয়। যেভাবে একটা বড় ইঞ্জিন অনেক কল-কব্জাকে চালনা করে, তাতে গতি সঞ্চার করে, একইভাবে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি গতিবিধি এবং স্থিতি-অবস্থাকে সেই ইঞ্জিনের মহান শক্তির অধিনস্ত না করবে সে কীভাবে খোদাকে এক-অদ্বিতীয় উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করতে পারে?আর إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ (আল-আনআম: ৮০) বলার সময় সত্যিকার অর্থে নিজেকে কীভাবে 'হানীফ' বা একত্ববাদী আখ্যা দিতে পারে? যেভাবে মৌখিকভাবে দাবি করে সেভাবে তার দৃষ্টিও সেদিকে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। (সমস্ত মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ করার কথা সে বলে আর ইবাদতকারী একত্ববাদী হওয়ার দাবিও করে। তিনি বলছেন যে, তার পূর্ণ মনোযোগও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিই নিবদ্ধ হওয়া উচিত। এমন অবস্থা যদি হয়) তবে নি:সন্দেহে সে মুসলমান এবং সে মু'মিন ও একত্ববাদী। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে প্রার্থনা বা যাচনা করে আর অন্য কারো প্রতিও নতজানু হয়, তার স্মরণ রাখা উচিত, সে বড়ই দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত, কেননা এমন সময় তার জীবনে আসবে যে, মৌখিক বা বাহ্যিকভাবেও সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নতমস্তক হতে পারবে না। " পুনরায় বলেন, "নামায পরিত্যাগ করা আর আলস্যের বড় একটি কারণ হল মানুষ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে যখন নতজানু হয় তখন হৃদয় ও আত্মার শক্তিসমূহের অবস্থা সেই বৃক্ষের মত সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। (যার শাখা প্রথমদিকে একদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আর সেদিকেই সেই শাখাগুলো বড় হতে থাকে) (অতএব, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, নামায ছেড়ে দেওয়া বা নামায পড়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখানো এবং আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে অন্যদের ওপর বেশি যদি নির্ভর করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষের ন্যায় দূরে সরে যেতে থাকে যার শাখা গুলোকে যদি একদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলিসেই দিকেই বড় হতে থাকে।) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক কঠোরতা তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে তাকে নির্জীব পাথর বানিয়ে দেয়। যেমনটি কি-না সেসব শাখা হয়ে থাকে। (যে শাখাগুলো এক দিকে ঝুঁকে পড়ে) আর এরপর অন্যদিকে আর ঘুরতে পারে না। অনুরূপভাবে হৃদয় এবং আত্মা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এটি বড় ভয়াবহ এবং হৃদয় কাঁপানো বিষয় যে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের যাচনা করবে। এই কারণেই নামায রীতিমত এবং নিয়মিত পড়া একান্ত আবশ্যক যেন তা প্রথমতঃ এক বদ্ধমূল রীতিতে পরিণত হয় আর আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা মাথায় আসে। এরপর ক্রমেই সেই সময় উপস্থিত হয় যখন মানুষ জগতের সাথে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নূর এবং এক স্বাদ লাভ করে। (সব কিছু থেকে পৃথকও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে শুধু আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে থাকে। তখন মানুষ এক জ্যোতি লাভ করে এবং সেই স্বাদ পায়।) আমি এ বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে বলছি, পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের দ্বারস্ত হওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার মত ভাষা আমি খুঁজে পাই নি। মানুষের সামনে গিয়ে এরা মিনতি ও তোশামোদ করে। এটি খোদা তা'লার আত্মাভিমানকে উদ্বেলিত করে, কেননা এটি মানুষের জন্য নামায পড়া, আল্লাহ্ তা'লার জন্য নয়। আল্লাহ্ তখন এমন ব্যক্তি থেকে পৃথক হয়ে যান, তাকে দূরে ঠেলে দেন। বিষয়টি আমি সাদামাটা ভাষায় বলতে চাই, যদিও বিষয়টি এমন নয় যে, কিন্তু সহজবোধ্য। যেভাবে এক আত্মাভিমানী পুরুষের আত্মাভিমান তার স্ত্রীকে অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখা পছন্দ করে না, যেভাবে সেই পুরুষ এমন ব্যাভিচারিনী মহিলাকে হত্যাযোগ্য মনে করে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেও যায়। আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান এবং আত্মসম্মানবোধ এমনই। খোদা বড়ই আত্মাভিমানী। প্রকৃত অর্থে দাসত্ব এবং বিশেষ দোয়া আল্লাহ্ তা'লারই প্রাপ্য, তাঁর সামনেই নিবেদন করতে হয়। সেই সত্তার সামনেই নিবেদন করতে হয়, তিনি অন্য কাউকে মাবুদ বা উপাস্য হিসেবে গণ্য করা পছন্দ করতে পারেন না। তাই স্মরণ রেখো, ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, অন্যদের সামনে নতজানু হওয়া আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। নামায বা একত্ববাদ যা-ই বল না কেন তৌহিদের মৌখিক স্বীকারোক্তির নামই হল নামায। এটি তখন অর্থহীন ও কল্যাণহীন হয়ে পড়ে যখন তাতে বিলীনতা এবং বিনয়ের স্পৃহা এবং অন্তরে একত্ববাদ থাকে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৬৬-১৬৮)

অতঃপর তিনি নামাযে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেন। বিভিন্ন ধরণের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার কথা অনেকেই বলে, বিভিন্ন ধরণের চিন্তাভাবনা মাথায় জাগ্রত হয় নামাযে। তিনি বলেন, "যাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পুরো মনোযোগ থাকে না তাদেরই নামাযে বিভিন্ন প্রকার চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। দেখ এক বন্দী যখন বিচারকের সামনে দণ্ডায়মান থাকে তার হৃদয়ে কি অন্য ধারণা আসতে পারে? (এক বন্দী যখন বিচারকের সামনে দণ্ডায়মান থাকে তখন অন্য ধ্যান-ধারণা মাথায় আসতে পারে না। দৃষ্টান্তটি এমনিই) কখনই নয়, (এমন চিন্তা-ভাবনা আসতেই পারে

না মাথায়।) সে পূর্ণ মনোযোগসহকারে বিচারকের সামনে দণ্ডায়মান থাকবে, সে এটি শোনার জন্য উদগ্রীব থাকবে বিচারক কী সিদ্ধান্ত দেন, সে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন অবহিত থাকে, অনুরূপভাবে মানুষ যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহমূখী হয় আর আন্তরিকভাবে তাঁর দরবারে সেজদাবনত হয় তখন শয়তান কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবে এটি কীভাবে সম্ভব? ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০-৯১)

নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কেন করা উচিত এবং নামায কেন পড়তে হবে? আমাদের নামাযের আল্লাহ্‌র কী কোন প্রয়োজন আছে? অধিকাংশ মানুষের মাথায় এ প্রশ্ন জাগে। আজকের নাস্তিকতার প্রভাবে এমন প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়েই থাকে। সেটি ব্যাখ্যা করেছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে, আল্লাহ্ তা'লা পরবিমূখ, আমাদের ইবাদতের তিনি মুখাপেক্ষি নন বরং আমরাই তাঁর মুখাপেক্ষি। তিনি বলেছেন: পুনরায় স্মরণ রাখা উচিত যে, নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ বা সুরক্ষা একারণেই করা হয় না যে, আল্লাহ্ আমাদের নামাযের মুখাপেক্ষি, আমাদের নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন। তিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন বরং এর অর্থ হল মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষি। এটি একটি জানা কথা, আসল কথা হল মানুষ নিজের কল্যাণ চায় আর এ কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সে সাহায্য চায়। এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রকৃত কল্যাণ লাভ করার নামান্তর। এমন ব্যক্তির সারা পৃথিবীও যদি শত্রু হয়ে যায় এবং তার ধ্বংস চায় তবুও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমন ব্যক্তির জন্য লক্ষ কোটি মানুষকেও যদি আল্লাহকে ধ্বংস করতে হয় তা তিনি করেন। একের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষকে ধ্বংস করেন।”

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬)

এরপর সাহাবীরা কীভাবে জয়যুক্ত হয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন: নিষ্ঠার মত কোন তরবারী নাই যা মন জয় করতে পারে। এমন বিষয়ের মাধ্যমেই তাঁরা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হয়েছেন। শুধু মুখের কথায় এইসব বিষয় অর্জিত হতে পারে না। এখন মানুষের ললাটে জ্যোতিও নেই, আধ্যাত্মিকতার কোনও আভা নেই, তত্বজ্ঞানের কোন অংশ নেই। (নামায কাকে বলে তা বুঝে না। নামায পড়ার কারণে যে জ্যোতিঃ লাভ হয় তাও তাদের মাঝে নেই। নামাযকে বোঝা মনে করা হয়।) তিনি বলছেন, আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারী নন। আসল কথা হল- এদের হৃদয়ে নিষ্ঠা নেই। শুধু বাহ্যিক কর্ম যা প্রথাগতভাবে করা হয়, অভ্যাস জনিতভাবে করা হয় তার ফলে কিছুই লাভ হয় না। (আল্ল াহ্ তা'লার ফজলে জামা'তে অনেকেই এমন আছে যারা বিশুদ্ধ চিত্তে নামায পড়েন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সে যুগের ব্যবহারিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। আমাদের জন্য এতে শিক্ষনীয় দিক ও সতর্কবার্তাও রয়েছে।এই কথাগুলোকে সামনে রাখবেন।) এর দ্বারা কেউ যেন এই কথা মনে না করে বসে যে, আমি নামাযের তাচ্ছিল্য করছি। কুরআনে যে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল মেরাজ। আজকের নামাযীদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে দেখুক যে, এরা কি সূরা ফাতেহার অর্থও জানে কি না? এমন নামাযীও পাবেন যারা পঞ্চাশ বছর ধরে নামায পড়ছে, নামাযের অর্থ এবং মর্ম জিজ্ঞেস করলে দেখবেন যে অধিকাংশই অনবহিত, যদিও সমস্ত জাগতিক জ্ঞান এই সব জ্ঞানের সামনে অর্থহীন। জাগতিক জ্ঞানের জন্য মানুষ সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু এদিকে এমন উদাসীনতা যে এটিকে মন্ত্রের মত পাঠ করা হয়। (অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা এটিই।) আমি বরং এতদূর পর্যন্ত বলে থাকি যে, নামাযে নিজের ভাষায় দোয়া করা থেকে বিরত থেকো না। উর্দূ, পাঞ্জাবিতে এবং ইংরেজিতে, যার যেটি ভাষা সে ভাষায় তার দোয়া করা উচিত। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্‌র বাণীকে সেভাবে পড় যেভাবে নাযিল হয়েছে, তাতে নিজের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করবে না। এটিকে সেভাবে পড় এবং অর্থ বোঝার চেষ্টা কর। অনরূপভাবে দোয়া মাসূরাও সে ভাষাতেই পড়। কুরআন এবং রসূলের নির্ধারিত দোয়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে যা চাও যাচনা কর, যে ভাষায় ইচ্ছা যাচনা কর, তিনি সব ভাষা জানেন, শুনেন এবং গ্রহণ করেন। তোমরা যদি নামাযকে তৃপ্তিদায়ক এবং উপভোগ্য করে তুলতে চাও, তাহলে নিজের ভাষায় কিছু না কিছু দোয়া করা আবশ্যক। কিন্তু প্রায়শ: দেখা গেছে নামায তো তড়িঘড়ি ঠোকর মেরে শেষ করে দেয় এবং দোয়া আরম্ভ করে দেয়। (অধিকাংশ মুসলমান দেশে অ-আহমদীদের মধ্যে এটিই প্রচলন। তড়িঘড়ি নামায শেষ করে এরপর হাত উঠিয়ে দোয়া আরম্ভ করে।) তিনি বলেন, এদের অবস্থা থেকে এটিই মনে হয় যে, নামায একটি অন্যায় 'কর' যা চাপানো হয়েছে। কিছু নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে তা নামাযের পর করা হয়। তারা এটি জানে না যে, নামায দোয়ারই নামান্তর, যা পরম বিনয়, অনুনয়-বিনয় এবং নিষ্ঠা আর ব্যাকুলতার সাথে করা হয়। অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের চাবিকাঠি হল দোয়া। খোদার কৃপার দার মুক্ত করার প্রথম সিঁড়িই হল দোয়া।নামায প্রথাগত ও অভ্যাসজনিতভাবে পড়া কল্যাণকর নয় বরং এমন নামাযিদের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা অভিসম্পাত করেছেন, তাদের দোয়া গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করার তো দূরের কথা 'ওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন' আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন। এই সব নামাযিদের সম্পর্কে বলেছেন যারা নামাযের মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে অনবিহত। সাহাবীদের নিজেদের ভাষা ছিল আরবি, তারা নামাযের অর্থ ভালোভাবে বুঝতেন কিন্তু আমাদের জন্য আবশ্যক হল এর অর্থ বুঝা এবং নামাযকে সেভাবে উপভোগ্য করে তোলা, কিন্তু এরা এমনটি ধরে নিয়েছে যেন দ্বিতীয় কোন নবী এসে গেছে যিনি নামাযকে রহিত করেছেন।” (হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এরা যে সমস্ত অপলাপ করে সেগুলো সম্পর্কে তিনি (আ.) বলছেন যে, আমি যখন বলি যে, নিজের ভাষায় দোয়া কর তখন এরা বলে যে, ইনি নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন।) তিনি (আ.) বলেন দেখ, আল্লাহ্ তা'লার এতে কোন লাভ নেই, এতে মানুষেরই কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তা'লার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় আকুতি-মিনতি বা আবেদন নিবেদনের সম্মানে তাকে সম্মানিত করা হয় যার ফলে সে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমি আশ্চর্য হই যে, এরা কীভাবে জীবন নষ্ট করছে যাদের দিন ও রাত্রি একইভাবে কেটে যায় কিন্তু এরা জানে না তাদের কোন খোদা আছেন। স্মরণ রেখো! এমন মানুষ আজকেও ধ্বংসপ্রাপ্ত আর কালও। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করছি, হায়! যদি তা মানুষের হৃদয়ে স্থান পেত! দেখ জীবনের আয়ু ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে, ঔদাসিন্য পরিহার কর, আকুতি মিনতি কর, নিভৃতে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সুরক্ষা করেন এবং তিনি যেন তোমাদের উপর প্রীত ও সন্তুষ্ট হোন।”

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১১-৪১৩)

প্রকৃত নামায কী সে সম্পর্কে একবার নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন: 'ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফীনা লানাহাদিআন্না হুম সুবুলানা' (আল-আনকাবুত: ৭০) তাঁর পথে পূর্ণ চেষ্টাকে নিয়োজিত কর তাহলে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। (চেষ্টা কর, সংগ্রাম কর) তিনি বলেন, তওবা ও ইস্তেগফার আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম। এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। (আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, আমাদের পথে যারা চেষ্টা সাধনা করে আমরা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকি।) আল্লাহ কারো প্রতি কার্পণ্য করেন না। এসব মুসলমানদের মধ্য থেকেই কুতুব, আবদাল এবং গাউস হয়েছেন, এখনও তাঁর রহমতের দার রুদ্ধ নয়। আত্মসমর্পণকারী হৃদয় সৃষ্টি কর, যত্নসহকারে নামায পড়, নিয়মিত দোয়া কর, আমাদের শিক্ষা অনুসরণ কর, আমরাও দোয়া করব। স্মরণ রেখ! আমাদের রীতি অবিকল তাই যা রসূলে করীম (সা.) এবং সাহাবীদের রীতি ছিল। আজকাল পীর ফকিররা অনেক বিদাতের প্রবর্তন করেছে। চিল্লা করা আর বিভিন্ন ওজিফা যে তারা প্রচলন করেছে এগুলো আমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (অনেকেই লিখে যে, কী দোয়া করব, বিশেষ কী দোয়া আছে বা বিশেষ কী চেষ্টা করা উচিত। আসল বিষয় হল নামায, সকল আহমদীর নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ থাকা উচিত।) আসল ইসলামী রীতি হল কুরআনে করীমকে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়া। আর যা কিছু এতে আছে তার ওপর অনুশীলন করা এবং নামায মনোযোগ সহকারে পড়া। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা। অতএব নামাযই এমন বিষয় যা মানুষকে মেরাজের পর্যায়ে উপনীত করে। এটি যদি ঠিক থাকে, অটুট ও অক্ষুন্ন থাকে তাহলে সবই ঠিক থাকবে।”

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৭)

সেই নামাযই মেরাজের পর্যায়ের উপনীত করে যা আল্লাহ্‌র দরবারে দণ্ডায়মান ব্যক্তির হৃদয়কে বিগলিত করে।

ফরয নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতিও তিনি তাগিদপূর্ণ নসীহত করেছেন। আনসারুল্লাহ্‌র বিশেষভাবে এর ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলছেন: “এই পুরোটা জীবন যদি জাগতিক কাজেই কেটে যায় তাহলে পরকালের জন্য কী সঞ্চয় করলে?” (যদি পুরো আয়ুষ্কাল জাগতিক কাজে কাটিয়ে দাও পরকালের জন্য কী সঞ্চয় করলে?) তাহাজ্জুদে বিশেষভাবে উঠো, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আগ্রহের সাথে তাহাজ্জুদ পড়। মধ্যবর্তী নামাযে কর্ম ব্যস্ততার কারণে মানুষ পরীক্ষায় পড়ে যায়। (অনেক সময় এমন পরীক্ষা আসে যে, নামায কাজা হয়ে যায়।) প্রকৃত রিয্ক দাতা আল্লাহ্ তা'লা। নামায যথাসময় পড়া উচিত। যোহর এবং আসর কখনও কখনও জমা করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানতেন যে দুর্বল মানুষও থাকবে। তাই সুযোগ রেখেছেন। কিন্তু এই সুযোগ তিনটি নামায একত্রিত করার জন্য দেয়া হয় নি। চাকরি এবং অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানুষ শাস্তি পায় বা কর্মকর্তার প্রকোপভাজন হয়, অতএব আল্লাহ্ তা'লার জন্য কষ্ট হলে অসুবিধা কী?”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬)

জাগতিক কাজের জন্য যদি মানুষ শাস্তি পায়, সমস্যার সম্মুখিন হয় আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানার জন্য যদি এই কষ্ট সহ্য কর তাহলে অসুবিধা কী বা সমস্যা কী।তিনি বলছেন: এটি খোদার পরম অনুগ্রহ যে, তিনি পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ ধর্ম রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণে কোন যোগ্যতা ছাড়াই কোন কষ্ট এবং পরিশ্রম ছাড়াই আমাদেরকে দিয়েছেন। এ যুগে আপনাদেরকে যে পথ দেখানো হয়েছে অনেক আলেম এখন পর্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত। (আহমদীদের প্রতি খোদা তা'লা কৃপা করেছেন মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার কল্যাণে, সেই পথ তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন।) খোদার এ ফযল এবং নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর সত্যিকার কৃতজ্ঞতা হল আন্তরিকভাবে সেইসব পুণ্য কর্ম করা যা সঠিকভাবে বিশ্বাস স্থাপনের পর আসে। আর নিজের অবস্থায় পরিবর্তন আনার পর তোমরা দোয়া কর, যেন আল্লাহ তা'লা সেই সঠিক ও সত্য বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং নেক কর্মের তৌফিক দেন। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের অন্তর্গত বিষয়। একটু চিন্তা কর, দৃষ্টান্তস্বরূপ নামাযকেই নাও। এ পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু এটি এ পৃথিবীর বিষয় নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন যে, 'কুররাতুআইনি ফিসসালাত'।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৯-১৫০)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তৌহিদ বা একত্ববাদের পূর্ণতা কীভাবে আসে সে সম্পর্কে বর্ণনা করেন:

"মানুষের জীবনে সকল আশা-আকাঙ্খা দানকারী এবং সকল রোগ-ব্যাধি নিরাময়কারী সেই এক-অদ্বিতীয় সত্তাকে গণ্য করা হলে তবেই তৌহিদ বা একত্ববাদ পূর্ণতা লাভ করে। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ এটিই। সুফিরা 'ইলাহ'র অর্থ করেছেন প্রেমাষ্পদ, উদ্দেশ্য এবং উপাস্য। নিঃসন্দেহে এটিই সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে, তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহাত্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এখন আমি আসল কথার দিকে ফিরে এসে বলছি যে, নামাযের স্বাদ এবং আনন্দ তার লাভ হতে পারে না আর এটি যেভাবে লাভ হওয়া সম্ভব তাহল যতক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র চিন্তাধারা ভস্মিভূত না হবে, আমিত্ব আর গর্ব দূরিভূত হয়ে বিনয় অবলম্বন না করা হবে আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা আখ্যায়িত হতে পারে না। আর পূর্ণ দাসত্ব শেখানোর জন্য নামাযই হল সর্বোত্তম শিক্ষক এবং মাধ্যম। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ্র সাথে যদি সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও, সত্যিকার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তাহলে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে, কেবল তোমাদের দেহ এবং মুখ নয় বরং তোমাদের আত্মা, দেহ এবং আবেগ অনুভূতি যেন মূর্তিমান নামায হয়ে যায়।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৯-১৭০)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, নামাযের হেফাজতের এবং উপভোগ্য নামায পড়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের উপাস্য বানানোর পরিবর্তে আমরা যেন সব সময় আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের সত্যিকার উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করতে পারি।এই যে এখানে আনসারুল্লাহর ইজতেমা হচ্ছে আমি জানতে পেরেছি যে, হয়ত মাগরিব ও এশার নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকবে না, কেননা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই জায়গা তাদেরকে খালি করতে হবে, হল খালি করতে হবে। যদি এটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থাপকদের সেখানে এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যেন যেখানেই যান না কোন যেন অন্যত্র গিয়ে বাজামাত নামায পড়া যায়। ভবিষ্যতে আনসারুল্লাহ্র উচিত এমন স্থানে ইজতেমার আয়োজন করা যেখানে পাঁচ বেলার নামায বা-জামাত পড়ার সুযোগ থাকে। আল্ল াহ্ তা'লা তাদের ইজতেমা সফল করুন আর আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত করুন।

প্রথম পাতার পর.....

****

৮৪ নং নিদর্শন: ১৯০৬ সালের ২৫ শে আগষ্টে একবার আমার শরীরের নিম্ন অর্ধাংশ অবশ হইয়া গেল। এক কদম চলারও আমার শক্তি রহিল না। যেহেতু আমি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়াছিলাম, সেহেতু আমার মনে হইল ইহা পক্ষাঘাতের লক্ষণ। ইহার সাথে মারাত্মক ব্যাথাও ছিল। মনে আশঙ্কা ছিল। পাশ ফিরা মুশকিল ছিল। রাত্রে যখন আমি অনেক কষ্টের মধ্যে ছিলাম তখন আমার শত্রুদের নিন্দার কথা মনে হইল। এই ধারণা কেবল ধর্মের জন্য আসিল, অন্য কারণে নয়। তখন আমি আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করিলাম যে, মৃত্যু তো একটি অনিবার্য বিষয়। কিন্তু তুমি জান এইরূপ মৃত্যু ও অসময়ের মৃত্যু হইলে শত্রুরা নিন্দা করিবে। তখন আমার কিছুটা তন্দ্রার মধ্যে ইলহাম হইল-

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْزِى الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ খোদা সব কিছুর উপর শক্তিমান এবং খোদা মোমেনদেরকে লাঞ্ছিত করেন না। অতএব ঐ খোদায়ে করীমের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে এবং যিনি এখনো দেখিতেছেন যে, আমি তাঁহার নামে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতেছি কি না সত্য কথা বলিতেছি, এই ইলহামের সাথে সাথেই সম্ভবতঃ আধ ঘন্টার মধ্যে আমার ঘুম আসিয়া গেল। অতঃপর যখন চোখ খুলিল তখন আমি দেখিলাম যে, রোগের নাম-নিশানাও নাই। সকল মানুষ নিদ্রিত ছিল। আমি উঠিলাম এবং নিজের শারিরীক সুস্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য চলিতে শুরু করিলাম। তখন প্রতীয়মান হইল আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। তখন আমি সর্বশক্তিমান খোদার মহান শক্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাদের খোদা কত শক্তিমান। এবং আমরা কত সৌভাগ্যবান যে, তাঁহার কালাম কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসূলে অনুবর্তিতা করিয়াছি, এবং কত হতভাগ্য ঐ সকল লোক যাহারা এই ক্ষমতাধর খোদার উপর ঈমান আনে না।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৪৩-২৪৬)

বারো ও দুইয়ের পাতার পর.....

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাই সেই সংস্কারক, যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি সেই সংস্কারকের আগমণ সম্পর্কে কয়েকটি নিদর্শন ও লক্ষণাবলীও বর্ণনা করেছিলেন যা পূর্ণতা লাভ করেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব আমরা তো নিজের কাজ করে চলেছি। বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল ছিল, তারা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝে নি, কেননা উলেমা ও পণ্ডিতবর্গ তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। তাদের কাছে আমাদের বাণী পৌঁছে গেছে। (তাদের মধ্যে আরব জাতিও আছে এবং মুসলমানদের অন্যান্য জাতিও আছে) তারা আমাদের বার্তা বুঝেছে। ফলে তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা ও যুক্তি-বিতর্ক করার পর নিজেদের পুরনো চিন্তাধারা ত্যাগ করে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। যদিও এখনও অনেকে তাদের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির উপর অবিচল রয়েছে, তথাপি তাদের একটি বড় অংশ এই বাণী বোঝার পর তা গ্রহণ করেছে।

এরপর একজন মহিলা সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যেরূপ হুযুর এখনই উল্লেখ করেছেন যে, কিছু সন্ত্রাসী রয়েছে যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করে না, যেমন- দায়েশ, তাদের মধ্যেও খিলাফত রয়েছে, তাদের একটি অঞ্চলও রয়েছে। আপনিও খলীফা, কিন্তু আপনাদের কাছে কোন দেশ নেই, তবে কি আপনার খিলাফত দায়েশের বিকল্প? এবং আপনার খিলাফত কি একথা প্রমাণ করতে চাইছে যে, খিলাফতের জন্য কোন দেশের প্রয়োজন হয় না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক ব্যবস্থার জন্য কোন না কোন নীতি বা যুক্তি থাকে। খিলাফত প্রতিনিধিত্ব বা উত্তরাধিকারকে বলা হয়। যেরূপ আমি একটু আগেই বলেছি যে, রসূলে করীম (সা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন-শেষ যুগে একজন প্রকৃত অনুসারীর আবির্ভাব হবে যিনি মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করবেন। তিনি (সা.) তাঁর কয়েকটি লক্ষণ ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন তাঁর সাক্ষাত পাও তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। এই হাদীসেই তিনি বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর প্রকৃত খিলাফতের (খিলাফতে রাশেদা) অবসান ঘটবে।

আজ আমরা দেখছি যে, এক হাজার বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত খিলাফত আসে নি। কিছু সময়ের জন্য পরবর্তীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু তা টিকে থাকে নি। শেষ খিলাফত তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত ছিল আর বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সেটিরও অবসান হয়। অতএব এই বিষয়গুলিও মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যুগে সেই সংস্কারক আবির্ভুত হওয়ার পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা প্রকৃত খিলাফত হবে। অতএব আমাদের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তি এসে গেছেন। মহানবী (সা.) কয়েকটি পার্থিব ও অপার্থিব নিদর্শনের কথা বর্ণনা করেছিলেন যা পূর্ণ হয়েছে। যদি সব কিছু বর্ণনা করতে যাই তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। সংক্ষেপে বলব, খিলাফতের সূচনা তখনই হয় যখন কোন নবীর আগমণ হয়। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা নবীর পদমর্যাদা রাখেন। কিন্তু তিনি হলেন ছায়া নবী । তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যবস্থা সূচিত হয়েছে। এই কারণেই আমরা বলি যে, জামাত আহমদীয়ার খিলাফত প্রকৃত খিলাফত। বিগত ১০৯ বছর যাবৎ এই খিলাফতের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং চিরকাল অব্যাহত থাকবে। কেননা, রসূলে করীম (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, সেই ব্যক্তির আগমণের পর যে খিলাফতের ধারা সূচিত হবে তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: দায়েশের খিলাফতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন যে তারা আজ পর্যন্ত কি কি অর্জন করেছে? তাদের খলীফার কি পরিণতি হয়েছে? তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। (ক্রমশঃ.....)

২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২৪ শে আগস্ট, ২০১৭

(খুতবার শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল সন্তানের লালন পালন করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- নারীকে তার স্বামীর তত্ত্বধায়ক করা হয়েছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সংসার এবং সন্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার। প্রশ্ন হল সন্তানদের কীভাবে রক্ষা করা হয়? এটি সম্ভব সন্তান বা ভবিষ্যত প্রজন্মের সঠিক ও সর্বোত্তম প্রতিপালনের মাধ্যমে। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, ইসলাম একদিকে যেমন পুরুষকে যাবতীয় চাহিদা পূরণের দায়িত্ব দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে স্ত্রীকেও তার দায়িত্ব পালনের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে- তাই এটা কোথা থেকে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ঘর বন্দী করে রেখে তাদের অধিকার আত্মসাৎ করা হয়েছে বা করা হচ্ছে? পুরুষদেরকে যেখানে মহিলাদের অধিকারসমূহ প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেহেতু সে বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানের দেখাশোনা ও প্রতিপালনের কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না, তাই মহিলারা যেন সন্তানদের অধিকার প্রদান করে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদের প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যার কারণে তারা সন্তানের তত্ত্বাবধান সঠিকভাবে করার যোগ্যতা রাখে। মহিলারাও যদি একথা বলে যে, আমরা নিজেদের অধিকার অর্জন করব এবং পুরো দিন ঘরের বাইরে থাকব, তবে সন্তানের প্রাপ্য অধিকার কে প্রদান করবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব ইসলাম শিক্ষা দেয়, তোমরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ ভাগ করে নাও। প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের কাজ ভাগ করে নাও এবং হঠকারিতাবশতঃ সন্তানদেরকে যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না। নিজেদের অধিকার আদায়ের তাগিদে সন্তানদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না। অতএব, এটি আপত্তিজনক শিক্ষা নয় বরং এটি প্রশংনীয় ও অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা। অতএব আহমদী মায়েদের কোন প্রকারের অভিযোগ অনুযোগ থাকা কাম্য নয়, বরং তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আহমদী মায়েদের পবিত্র ক্রোড়গুলি সেই পবিত্র ভাণ্ডার এবং ভাণ্ডার রক্ষণের স্থান এবং সেখানে প্রতিপালিত সন্তানরা হল পবিত্র সম্পদ আর নেক তরবীয়তের কারণে তারা হল আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বস্তু। এমনও কি কেউ আছে যে এমন পবিত্র সম্পদ তৈরী করতে এবং অর্জন করতে চাইবে না? অতএব, হঠকারিতা দেখিয়ে এবং প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পরিবর্তে পবিত্র সম্পদ দ্বারা পবিত্র ভাণ্ডার পূরণ করার কাজ অব্যাহত রাখুন। জাগতিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন না, কেননা এই পৃথিবী কয়েক দিনের মাত্র। এই জগতের কয়েকটি দিনের জীবনের পেছনে ছোটার পরিবর্তে পরকালের সেই জীবন অর্জন করার চেষ্টা করুন যার ফলে ইহজাগতিক জীবনও জান্নাত হয়ে ওঠে এবং পরকালের জীবনও স্থায়ী জান্নাত হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করুন আঁ হযরত (সা.) পুণ্যবতী স্ত্রী এবং পুণ্যবতী মায়েদের কি মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য কোন সঞ্চিত সম্পদ নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে মনে করো না যে, তোমরা বিরাট সম্পদ অর্জন করে ফেলেছ। তিনি বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহ্‌র যিকর বা নামকীর্তনকারী জিহ্বা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী অন্তর এবং 'মো'মেনা' স্ত্রী যে তাকে ধর্মের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। অর্থাৎ স্বামীকে ধর্মের পথে পরিচালিত করার জন্যও মো'মেনা স্ত্রী কাজে আসে আর যারা ধর্মের সেবক তাদের সহায়কও মো'মেনা স্ত্রীই হয়ে থাকে। অতএব আঁ হযরত (সা.)-এর এই উক্তি নারী ও পুরুষ উভয়কে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, যদি সম্পদ সঞ্চয় করতে হয় যা এই পৃথিবীতেও কাজে আসবে এবং পরকালেও কাজে আসবে তবে নিজেদের জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে নিয়োজিত রাখ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহরাজির প্রতি নিজেদেরকে কৃতজ্ঞচিত্ত রাখ। এই বিষয় নিয়ে মনে কখনো আক্ষেপ রেখ না যে, অমুকের কাছে বেশি ধন-সম্পদ আছে আর আমার কাছে নেই বা অমুকে বাড়ি বিশাল আকারের আর আমাদের বাড়ি ছোট, অমুকের কাছে অমুক ও নতুন মডেলের গাড়ি আছে আর আমাদের কাছে নেই। মহিলারা যেন এদিকে দৃষ্টি না দেয় যে, অমুকের কাছে এত এত অলঙ্কারাদি আছে আর আমাদের কাছে নেই, আমাদের স্বামী তৈরী করে দেয় না। যদি স্বামীদের সেই সুযোগ থাকে তবে অবশ্যই স্ত্রীদের বাসনা পূর্ণ করা উচিত, কিন্তু যদি ঋণ করে বা আকণ্ঠ ঋণে ডুবে থেকে সেই বাসনা পূর্ণ করতে হয় তবে তা ধার্মিক মহিলার লক্ষণ নয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব প্রকৃত বিষয় হল আপনারা যেন ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকারকে সব সময় স্মরণ রাখেন। কেননা, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের পিতা বা পিতামহ আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। আপনাদের সেই সব বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। সেই সব কথা ভুলে গেলে নিজেদের ধর্মকে নষ্ট করবেন। আপনাদের মধ্যে যারা পাকিস্তানের তাদের অধিকাংশই নিজেদের দেশ থেকে এই কারণে নির্বাসিত হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছেন বা আপনাদের পিতা ও পিতামহরা এখানে এসেছেন যে, তারা নামধারী মোল্লাদের ধর্মের অনুসরণ করেন নি, বরং আঁ হযরত (সা.)-এর আদেশ অনুধাবন করার পর তা শিরোধার্য করে এই যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহকে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা মোল্লা এবং তাদের ধর্মের ভয়ে ভীত হয় নি। এই কারণে আপনাদেরকে সেই দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। অন্যথায় এই সমস্ত আহমদীদের কোন গুণ বা বিশেষত্ব আছে এবং কি-ই বা অধিকার আছে যারা এখানে শরণার্থী হয়ে থাকে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানে জার্মানে এসে বসবাস করা আপনাদের বিশেষ কোন গুণের কারণে নয়, আপনাদের কোন উচ্চ গুণ বা মানের কারণে নয়, বরং ধর্মের কারণে। যদি এটি ধর্মের কারণে হয়ে থাকে, তবে তা সময় স্মরণ রাখাও উচিত। এই দেশের মানুষ আহমদীদেরকে কেবল এই কারণে আশ্রয় দিয়েছে যে, নিজেদের দেশে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। অতএব এই কথাটি নারী ও পুরুষ উভয়ই স্মরণ রাখুন। যদি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকেন তবে আমরা এদের প্রতি প্রবঞ্চনাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা সকলকে তৌফিক দিন আপনারা যেন নিজেদের কথা এবং কর্মের মাধ্যমেও একথা প্রমাণ করেন যে, যে ধর্মের আপনারা মান্যকারী তা সত্য ধর্ম এবং তা তাদের অধিকারসমূহ রক্ষাকারী। জগতবাসীকে ইসলামের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করুন যাতে তারা জানতে পারে যে, পৃথিবীর মুক্তি খোদা তা'লার আদেশ মান্য করা এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নের মধ্যে নিহিত, জাগতিক হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত থেকে ধর্ম এবং খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়ার মধ্যে নয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে ধর্মের পথে পরিচালিত হওয়ার এবং নিজেদের ব্যবহারিক নমুনা দেখানোর প্রকৃত তৌফিক দান করুন। দোয়া করে নিন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করান। এরপর লাজনা ও নাসেরাতদের বিভিন্ন দল আফ্রিকান, আমেরিকান, আরবী, জার্মান, ইংরেজি, স্পেনিশ, তুর্কি, বোসনিয়ান ভাষায় সমবেত কণ্ঠে দোয়া সংবলিত নযম পরিবেশন করে।

২৬ শে আগস্ট, ২০১৭

প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মান এবং বিভিন্ন জাতির অতিথিদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য পুরুষ জলসাগাহে আসেন। এই সকল অতিথিদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান ইতিপূর্বেই অব্যাহত ছিল। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা ছিল ৭৭৯জন। জার্মানীর বিভিন্ন শহর থেকে আগত অতিথিদের সংখ্যা ছিল ২০৩, আরব অতিথিদের সংখ্যা ছিল ২২৭, এশিয়ান দেশগুলি থেকে আগত অতিথিদের সংখ্যা ছিল ১৭১ এবং আফ্রিকান দেশগুলি থেকে আগত অতিথিদের সংখ্যা ছিল ২৬জন। এছাড়াও বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশ যেমন-হল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, মেসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, কোসোভা বোসনিয়া, হাঙ্গেরী, ক্রোয়েশিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাতোভা এবং ইস্টোনিয়া থেকে আগত অতিথিদের সংখ্যা ছিল ৯০ জন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণের পর কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় যার পর এর জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন। (ইংরেজি ভাষায়)।

অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ এবং তাউযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমোতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, আমরা যারপরনায় জটিল এবং স্পর্শকাতর সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি। আমরা যদি আজকের বিশ্বের পরিস্থিতিকে অগভীর দৃষ্টিতেও দেখি তবে সর্বত্র ক্রমবর্ধমান শত্রুতা, অরাজকতা এবং অস্থিরতা চিত্রই দেখতে পাই। এমন মনে হয় যেন দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, এই পৃথিবীর অস্থিরতার জন্য ইসলামই দায়ী। আমি একথা বলা সঠিক বলে মনে করি না যে, কেবল মুসলমানরাই সমগ্র বিশ্বে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার আগুনকে উস্কে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুষ্টিমেয় নামধারী মুসলমান সংগঠন অবিশ্রান্তভাবে পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে চলেছে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে এবং জঘন্য ও বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে অমুসলিমদের মধ্যে সংশয় এবং ত্রাসের আবহ তৈরী করে রেখেছে। নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সত্য স্বীকার করতে কোন সংকোচ বোধ করি না যে, সমাজে অরাজকতা এবং বিভেদ সৃষ্টিতে এমন মুসলমানদের ভূমিকাই বেশি উল্লেখযোগ্য। এর একটি বড় কারণ হল উগ্রবাদী সংগঠন এবং উলেমারা অসহায় মুসলমানদেরকে নিজেদের শিকারে পরিণত করেছে এবং বিপথগামীদের পথ-প্রদর্শন করার পরিবর্তে তাদের মন-মস্তিষ্কে উগ্রবাদের বিষাক্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে কট্টরপন্থীতে পরিণত করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু মানুষের মাথায় এমনভাবে এই বিষাক্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে তারা ভয়ানক অত্যাচার ও নিপীড়ন করেছে, অন্যদিকে যারা এমন আক্রমণ করে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এমনই শয়তানী ভাবধারা পোষণ করে। এছাড়াও বেশ কিছু সময় থেকে আমরা দেখে আসছি যে, কয়েকটি মুসলিম দেশের প্রশাসন জনসাধারণের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করছে যার কারণে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা পরিশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এতদ্‌সত্ত্বেও এবিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, সন্ত্রাসীরা যা-ই দাবী করুক না কেন, তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। সেগুলি সংগঠনের পক্ষ থেকে সংঘটিত হোক বা কোন উগ্রবাদের ভাবধারায় প্রভাবিত কোন ব্যক্তির দ্বারা হোক, পাশ্চাত্যের দেশে হোক বা মুসলমান দেশগুলিতে হোক, এতে কিছু যায় আসে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষা মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই শিক্ষার ভিত্তিই রাখা হয়েছে সহানুভুতি, ভালবাসা এবং মানবতার উপর আর জামাত আহমদীয়া এই মূল্যবোধের উপরই বিশ্বাস রাখে এবং বিগত একশ বছর যাবৎ পৃথিবীতে এই মূল্যবোধ প্রসারের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে চলেছে। অতএব আমি পুনরায় বলব যে, ইসলাম কখনোই কোন প্রকারের অন্যায়, অত্যাচার বা অপকর্মের অনুমতি দেয় না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পরিবর্তে ইসলাম তার উন্মেষলগ্ন থেকেই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এসেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বস্তুত, যে কুরআন মজীদকে মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইসলামের পয়গম্বর (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তার প্রথম 'সূরা'-য় বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কেবল মুসলমানদের প্রভু-প্রতিপালক নন, বরং তিনি খৃষ্টান, ইহুদী এবং সকল ধর্মের অনুসারীদেরও 'রব্ব' বা প্রভু-প্রতিপালক এবং তিনি তাদেরও খোদা যারা না কোন ধর্ম মানে আর না খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অতএব খোদা তা'লার সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক। তিনি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপর নিজের কৃপা ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেছেন। এটি বোঝানোর জন্য কুরআন করীমে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হল, 'রাব্বুল আলামীন'। আল্লাহ্ তা'লা এখানে 'আলাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার ইংরেজি অর্থ হল World (পৃথিবী)। কিন্তু কোন অনুবাদই এই শব্দটিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে না। 'আলাম' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। এই শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ কোন বিশেষ ধর্ম বা বিশেষ সময়ে বসবাসকারী জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নন, বরং তিনি প্রত্যেক যুগের সমস্ত জাতি ও ধর্মের মানুষের 'রব্ব' বা প্রভু-প্রতিপালক। অতএব এই শব্দটির মধ্যে অনন্য সৌন্দর্য্য এবং গভীর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। এই শব্দবন্ধনের মধ্যে বিশ্বজনীন সাম্য নীতির পবিত্রতা ধরে রাখা হয়েছে এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে কারো জন্য কোন প্রকারের জাতিগত বা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের স্থান নেই। এই শব্দগুলি দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, অল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও আশিস কোন বিশেষ জাতি ও বংশের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং কোন ভেদাভেদ ছাড়াই তা সকলের জন্যই। এটিই হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, এতদ্‌সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে জাতিবাদ এবং বর্ণ বৈষম্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বস্তুত যারা ইসলামের উপর এই অন্যায় অভিযোগ করে যে, এটি অ-মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে, তারা নিজেরাই এই অভিযোগের আওতায় আসে। উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি এক মার্কিন রাজনীতিক বিবৃতি দিয়েছে যে, অন্যান্য জাতি যেমন-কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয়ানদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গরা মানব সভ্যতায় বেশি অবদান রেখেছে। এর সাথে এও রিপোর্ট শোনা যাচ্ছে যে, আরও একজন মার্কিন বরিষ্ঠ নীতি নির্ধারক এই বিবৃতি দিয়েছে যে, শ্বেতাঙ্গরা অন্যদের তুলনায় বংশতগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি। এমন উগ্র ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য অন্যান্য জাতির মানুষের মধ্যে কেবল হতাশা সৃষ্টি করে এবং মর্মযাতনা দেয়। ইসলাম এর ঠিক বিপরীতে এই দাবী করে যে, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কোন জাতি অপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, আর না কোন জাতির মানুষ অপর কোন জাতির মানুষের থেকে বেশি মেধাবী। ইসলাম শিক্ষা দেয় খোদা তা'লাই সকলের প্রভু-প্রতিপালক। তবে একথা সঠিক যে, মানুষ পৃথিবীতে যত উন্নতি করতে পারে তা নির্ভর করে পরিবেশ এবং তার ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সাধনার উপর। কিন্তু জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতির মানুষকে প্রাথমিক যোগ্যতা সমানভাবে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে ইসলামের পয়গম্বার (সা.) 'খুতবা হাজ্জাতুল বিদা' নামে অভিহিত তাঁর মহান ভাষণে এই বিষয়টিকেই বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য পৃথিবীতে শান্তির ভিত রচনা করেছিল। এই ভাষণের শব্দগুলি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল যা আজও অক্ষয় ও অমর হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, সমস্ত মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়। শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই বা কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, আরব অনারবদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয় বা অনারব আরবদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ইসলামের পয়গম্বার (সা.) বিশ্ব মানবাধিকারের অমর আলোকবর্তিকা উন্নীত করে ঘোষণা করেন- 'সমস্ত মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের সকলের অধিকার সমান।'

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিঃসন্দেহে আজ ইসলাম সম্পর্কে একাধিক ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি হয়েছে, অতএব এমন সময় এই অম্লান নীতির পুনারাবৃত্তি করা অত্যন্ত জরুরী যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম যাবতীয় প্রকারের বৈষম্য ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কেবল দৈহিক এবং বৌদ্ধিক যোগ্যতার দিক থেকেও সমান করেছেন, বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম দাবি করে যে, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিতে নবী বা রসূল প্রেরণ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সকল নবীকে সম্মান করে। এই কারণে আমরা প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা মনীষিদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি এবং কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলার বিষয়ে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন বিরোধী যদি ইসলামের পয়গম্বারের অবমাননা করে, তবুও একজন প্রকৃত মুসলমান কোন পয়গম্বার বা মনীষির বিরুদ্ধে অপলাপ করতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সম্পর্কে আমরা যখন কাউকে কোন অবমাননাকর কথা বলতে শুনি, তখন আমরা যারপরনায় অস্থির ও বিচলিত হয়ে উঠি এবং আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় আমরা কখনোই অন্যদের ধর্মের পয়গম্বার এবং মনীষিদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা বলব না। এমন বিদ্বেষ ও শত্রুতার প্রকাশ পেলে আমাদের ধর্ম শান্তি ও ভালবাসা সহকারে তার উত্তর দেওয়ার জন্য প্রেরণা দেয়। ইসলাম কেবল একথাই বলে না যে, অন্যদের পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কথা বলো না, বরং এর থেকে আরও একধাপ এগিয়ে এই শিক্ষা দেয় যেরূপ সূরা আনআমের ১০৯ নং আয়াতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানেরা যেন পৌত্তলিকদের প্রতিমা বা মূর্তিকেও মন্দ না বলে, কেননা, এর ফলে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ্‌কেও গাল-মন্দ করবে, নিঃসন্দেহে যা মুসলমানদের আবেগ অনুভুতিতে আঘাত হানবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীম ঘৃণা ও বিদ্বেষের এক অনন্ত ধারার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে, যা পরিশেষে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়, মুসলমানদেরকে আদেশ দেয় যে, তারা যেন ধৈর্য দেখায় এবং সতত উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ৬৫ নং আয়াতটিও পরধর্ম সহিষ্ণুতার ভিত রচনা করে। এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মের মানুষ, বিশেষত: আহলে কিতাব (ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান) যেন একক মতবিশ্বাসের ভিত্তিতে খোদা তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। অতএব কুরআন মজীদ মানবজাতিকে একক মূল্যবোধের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং পারস্পরিক মতবিরোধকে দূরে সরিয়ে রাখার শিক্ষা দেয়। কুরআন মজীদ এখানে একথাও বর্ণনা করে যে, অ-মুসলিমরা এই আদেশ মান্য করুক বা না করুক, মুসলমানদের কর্তব্য হল তার সর্বাবস্থায় অপরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং হৃদয় তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামের উপর আরও একটি অভিযোগ যা আরোপ করা হয় সেটি হল এই যে, অন্যদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য মুসলমান বল প্রয়েগের অনুমতি দেয়। এটিই সম্পূর্ণ ভুল অভিযোগ, বরং এর বিরুদ্ধে কুরআন মজীদ সূরা বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে এই ঘোষণা করেছে যে, ধর্ম এবং মতবাদের বিষয়ে কোন প্রকারের বল-প্রয়োগ নেই। ইসলাম নিজেকে বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গীন ধর্ম হওয়ার দাবী করে আর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই যে, ধর্ম হল মানুষের অন্তরের বিষয়। এই কারণে কাউকে কখনো মুসলমান বানানোর জন্য বল প্রয়োগ করা যেতে পারে না। সূরা ইউনুসের ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন, যদিও আল্লাহ্ তা'লা শক্তি রাখেন সকলকে মুসলমান বানিয়ে দেওয়ার, কিন্তু তিনি কোন চাপ বা বলপ্রয়োগ ছাড়া মানুষকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব যে খোদার আমরা উপাসনা করি, তিনি অত্যাচারী হতে পারেন না, আর মানুষ (অনিচ্ছা সত্বেও) তার প্রতি নতজানু হোক এমনটিও তিনি চান না, বরং তিনি এমন আযিমুশশান সত্তা যিনি সকলকে স্বেচ্ছায় নিজের ধর্ম নির্বাচন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এর অর্থ কখনোই এটি নয় যে, মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের প্রচার করবে না, বরং এর বিপরীতে আল্লাহ তা'লা সমস্ত মুসলমানকে অন্যদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই প্রচার কার্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সহনশীলতা, প্রেম-প্রীতির আবেগ অনুভুতি এবং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের মাধ্যমে হওয়া কাম্য। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদের সূরা কাহফের ৩০ নং আয়াতে বলেন, মানবজাতিকে এই কথা পৌঁছে দেওয়া মুসলমানদের কর্তব্য যে, ইসলাম হল আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি সত্য, এটি গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে প্রত্যেকে স্বাধীন। অতএব, এই আবেগ অনুভুতি নিয়ে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার বাণীর দিকে আহ্বান করার চেষ্টা কর এবং খোদার সঙ্গে তাদের পরিচয় করাও। তাই আমরা ভালবাসা ও সহানুভুতির মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক জয় করতে চাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন মজীদ সূরা ইউনুসের ২৬ নং আয়াতে আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা শান্তির ঘরের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন। উক্ত আয়াতের মাধ্যমে এই নীতিটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইসলামের শিক্ষা মান্য করা বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। এই আয়াত আমাদেরকে বলে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে আহ্বান করছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন মানুষকে শন্তির ঘরের দিকে আহ্বান করেন, তখন মুসলমানদের ব্যক্তিগতভাবে অন্যদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যমে পরিণত হওয়া আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত বর্ণনা করেছি যা সম্পূর্ণভাবে সেই চিত্রকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যে, নাউযিবিল্লাহ্ ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা অ-মুসলিমদের অধিকার আত্মসাৎ করে এবং সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে তছনছ করে দেয়। কুরআন মজীদের সূরা কাসাসের ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এই সত্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত ইসলাম সব সময় শান্তিপূর্ণভাবেই বিস্তার লাভ করেছে আর আমরা এটি কোন নতুন দাবি করছি না। এই আয়াতে ঐ সমস্ত লোকেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা ইসলামের পয়গম্বারের যুগে ইসলামের বাণী পেয়েছিল কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কারণ আধ্যাত্মিক ছিল না বরং জাগতিক কারণ ছিল। তারা নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে, তাদের আশঙ্কা, যদি তারা এই বাণী স্বীকার করে নেয় তবে তাদের সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে এবং তাদের নিজের লোকেরা সম্পর্ক ছিন্ন করে নিবে। এরা মুসলমানদের ভয়ে ত্রস্ত ছিল না, কেননা তারা এই অপূর্ব সুন্দর শিক্ষাকে নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরখ করে দেখেছিল, বরং তাদের তো নিজেদের শাসনকর্তা এবং মানুষের ভয় ছিল। এই বিষয়টি এই সত্যের উপর মোহর লাগিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সাহাবাগণ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেছেন এবং কখনো কোন প্রকার বল প্রয়োগ করেন নি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা.) যে ইসলামের শিক্ষা দান করেছিলেন এবং যা তিনি নিজেও অনুশীলন করে দেখিয়েছিলেন তা উগ্রবাদ ও অত্যাচারের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং অ-মুসলিমরা কোন শাস্তি ছাড়াই তা প্রত্যাখ্যান করতে পারত। তারা কেবল নিজেদেরই অ-মুসলিম সর্দার ও গোষ্ঠীনেতাদের ভয়ে ভীত ছিল যারা তাদের ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করাকে সহন করতে পারত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি আপনাদের সামনে মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.)-এর নমুনাও তুলে ধরতে চাই। মক্কা ছিল মহানবী (সা.)-এর পিতৃভূমি। কিন্তু নবুয়তের দাবীর পর ১৩ বছর যাবৎ তিনি এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.) নিজেদের মানুষের হাতে নির্মম অত্যাচারের শিকার হতে থাকেন। মুসলমানদেরকে অসহনীয় যাতনা দেওয়া হয়। তাদেরকে সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়া হল, হত্যা করা হল, এমন মহানবী (সা.)-এর উপরও আক্রমণ করা হল। যেরূপ উপরে বর্ণিত হয়েছে, অবশেষে তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, তিনি হিজরত করতে বাধ্য হন। এতদ্সত্বেও যখন তিনি মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং গোটা শহর যখন তার করায়ত্ত হয়ে পড়ল, তখন তিনি প্রথম যে ঘোষণাটি করলেন, সেটি হল, আজকের দিনে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না যারা এত বছর ধরে মুসলমানদের উপর নির্মম ও বর্বর উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছিল। এই মহান বিজয়ের সময় আঁ হযরত (সা.) অসাধারণ বিনয় এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সকলকে এখনি ক্ষমা করা হল যারা মুসলমানদেরকে যাতনা দিয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি যে ঘটনা বর্ণনা করলাম সেটির আলোকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এবং আশা রয়েছে এবং আমি দোয়া করি যে, মানুষ ত্বরাপরায়ণতা না দেখিয়ে এবং অপরের শোনা কথায় বিশ্বাস করে ইসলামকে উগ্রবাদের ধর্ম অভিহিত করার পরিবর্তে এই সত্যকে সামনের রেখে এবং নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সততার সঙ্গে বিচার করবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন জিনিষকে প্রতিবিম্বিত করে। মানুষ তখনই বুঝতে পারবে যে, বিগত কয়েক বছরে ইসলামের নামে যে সমস্ত ঘৃণাত্মক কার্যকলাপ করা হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম বা যে কোন ধর্মকে এমন মানুষদের পাপের কারণে অপবাদ দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত কাজ, যারা নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করে। পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ সিংহভাগ সমরাস্ত্র তৈরী করে তাদের মূলত খৃষ্টান দেশ; সেই অস্ত্র-শস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে নিরীহ মানুষকে হত্যা করার এবং অন্যায়পূর্ণ ঝগড়া-বিবাদ জন্ম দেওয়ার কারণ হচ্ছে। তবে কি এক্ষেত্রে খৃষ্টবাদকে এই সমস্ত ভয়ানক অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্য দায়ী করা এবং এর উপর এমন অভিযোগ আরোপ করা সঙ্গতপূর্ণ হবে? কক্ষনো নয়! অনুরূপভাবে, আমি একথাও স্বীকার করি না যে, পৃথিবীতে বিরাজমান অরাজকতার জন্য কেবল মুসলমানরাই দায়ী। তাই আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা সকলেই বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত দুটি বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়ানক পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছি, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এবং অগণিত মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। এই দুটি মহা-যুদ্ধ মানব ইতিহাসের কালো অধ্যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, মানুষ তার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না, আর মানুষ পুনরায় সেই বিপজ্জনক গহ্বরের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। শান্তির জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে আলোচনার পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে জাগতিক পরাশক্তিগুলি দাপট ও হুমকি দেখানোর পথ বেছে নিয়েছে এবং তারা এমন সব মারণাস্ত্র তৈরী করছে যা পৃথিবীকে একাধিক বার ধ্বংস করে দিতে পারে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা প্রয়োগ করে এর বিভীষিকা দেখার সত্বেও মার্কিন রাষ্ট্র সমেত বিশ্বের একাধিক দেশ অবিবেচকের মত পূর্বের থেকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 2 Nov, 2017 Issue No. 44

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অনেক বেশি শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা তৈরীর কাজে ব্যস্ত রয়েছে এবং তারা যারপরনায় ভয়ানক পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে ৯টি দেশের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে তাদের মধ্যে পাকিস্তানই হল একমাত্র মুসলমান দেশ। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে না যে, মুসলমান দেশগুলি এই সকল ভয়ানক মারণাস্ত্রের কেন্দ্র যার কারণে মানব অস্তিত্ব আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন। এছাড়াও , যেরূপ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, মুসলমান দেশগুলির কাছে বিদ্যমান সমরাস্ত্রগুলির অধিকাংশই অ-মুসলিম দেশসমূহে নির্মিত হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, একদিকে অ-মুসলিম দেশগুলি মুসলিম দেশগুলিতে শান্তি চাইছে, আবার অপরদিকে এই দেশগুলিতে যুদ্ধ এবং অরাজকতার আগুন এরাই উস্কে দিচ্ছে, যারা কিনা নিজেরা এগুলির ঘোর নিন্দাও করে থাকে। অনেক সময় কিছু কিছু দেশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কতক সদর্থক পদক্ষেপও গৃহিত হয় যা পরিস্থিতি উন্নতির সামর্থ্য রাখে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এমন রাজনীতিকদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিগত সত্তর বছরের অধিক সময় ধরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সদিচ্ছাপূর্ণ চেষ্টার পরিবর্তে হুমকি ধমকির নীতি অনুসৃত হয়েছে যার অধীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে পূর্বের থেকে বেশি ভয়ানক অস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। দাবী যাই করা হোক না কেন, কিন্তু একটি বাস্তবতা যে, এমন পদক্ষেপের মাধ্যমে কখনো দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না। খুব সম্ভব, হয়তো কোন একদিন কেউ একটি বোতাম টিপে দিল যার ফলে পৃথিবী এমন এক ধ্বংসলীলার মুখে পড়বে যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। অতএব আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই নাম সর্বস্ব পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এখন একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট রয়েছে এবং সেটি হল আল্লাহ্ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ। এখন সেই সময় এসে গেছে যখন মানুষ তার স্রষ্টাকে চিনবে এবং জানবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ তা'লাই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু-প্রতিপালক যিনি আমাদের প্রতিপালনের যাবতীয় উপকরণ দিয়ে থাকেন এবং তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমাদের উপর তাঁর অনন্ত কৃপা ও অনুগ্রহ রয়েছে। এর বিনিময়ে তাঁর সামনে নতজানু হওয়া এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করা কি আমাদের কি কর্তব্য নয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ জাগতিক ধনসম্পদ এবং শক্তিকে প্রাধান্য দিবে, আমরা কখনো পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তির মুখ দেখতে পাব না। নিঃসন্দেহে এই লোভই মানুষকে নিজের স্বার্থে অপরের অধিকার আত্মসাৎ করার জন্য প্ররোচিত করে যার পরিণামে অস্থিরতা ও অরাজকতা জন্ম নেয়; ক্রমে যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি এক প্রবীণ মার্কিন রাজনীতিক বিবৃতি দিয়েছেন যে, সিরিয়া থেকে দাঈশদের সমূলে উৎপাটন করা কখনো মার্কিন স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, বরং এতদ্‌ঞ্চলে উক্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর যৎসামান্য উপস্থিতি পাশ্চাত্যের স্বার্থকে সুরক্ষিত করবে। একজন শান্তিকামী ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছে এই ধরণের যুক্তি কখনোই বোধগম্যপূর্ণ হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একদিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলি মুসলমানদেশগুলিকে যাবতীয় প্রকারের সন্ত্রাস বন্ধ করে শান্তি অবলম্বন করতে বলছে, কিন্তু অপরদিকে এর মধ্যে কিছু এমন শক্তিও রয়েছে যাদের আশঙ্কা রয়েছে যে, মুসলমান দেশগুলিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের শক্তি এবং আধিপত্য ক্ষুন্ন হবে। এমন কপটতা ও বক্র নীতি পৃথিবীকে কেবল অস্থির ও অশান্ত করেই তুলতে পারে। এছাড়াও, যেরূপ আমি ইঙ্গিতে বলেছি, পাশ্চাত্যের দেশগুলি এবং অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের স্বার্থের কারণে তারা মুসলমান দেশগুলির মধ্যে কিছুটা বিবাদ জিইয়ে রাখতে চায়। এমন নীতি এবং স্বার্থান্বেষী পদক্ষেপ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক; এটি বিশ্ব-শান্তিকে ধ্বংস করার কারণ হতে পারে। এর বিপরীতে ইসলামী শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং আমাদের ধর্ম এবিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রকৃত ন্যায়নীতিই হল শান্তির চাবিকাঠি। ন্যায় ও সাম্য ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ইসলাম এত দূর পর্যন্ত শিক্ষা দেয় যে, ন্যায়, সাম্য এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে কোন জাতি বা ব্যক্তিকে যদি নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা উচিত। অতএব, পারিবারিক স্তরে হোক বা সামাজিক, নগরীয়, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে হোক- পূর্ণাঙ্গীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত না হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেন যুদ্ধ করা হয়েছে বলে যারা অভিযোগ করে, সেই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলব যে, কুরআন মজীদের সূরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে কেবল প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন। তাসত্ত্বেও এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই অনুমতি কোন অঞ্চল দখল বা জয় করার জন্য দেওয়া হয় নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশ দিয়েছিলেন যাতে অরাজকতা এবং অন্যায়-অত্যাচারের অবসান হয় এবং চিরতরে ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি বিশ্বজনীন নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪১ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন উপাসনাগার, সাইনাগগ, মন্দির এবং সমস্ত ধর্মের উপাসনাগারের সুরক্ষা করে। এছাড়াও সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়াতে একথা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেখানে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে যেন একথাটিও দৃষ্টিপটে থাকে যে, এই যুদ্ধ সীমিত পরিসরে হবে এবং এর উদ্দেশ্যে হবে সবসময় অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটানো। এই শর্তাবলী পূর্ণ হয়ে গেলে এবং মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হবে। এই আয়াতে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন কেবল আক্রমণকারীদেরকে লক্ষ্য করেই কেবল আক্রমণ করতে হবে বা তাদেরকে বন্দী বানাতে হবে এবং নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। যুদ্ধের সময় অন্যান্য সম্পদ ও জিনিসপত্র নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই, দুর্ভাগ্য বশতঃ যেরূপ বর্তমান কালে যুদ্ধে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ইসলামে শক্তি বা বল প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেবল অত্যাচারীর হাতকে প্রতিহত করার জন্য এবং কখনো কোন অঞ্চল জয় করার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অপরকে প্ররোচিত করা, অরাজকতা সৃষ্টি করা এবং উস্কানি দেওয়াকে গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখে। এই কারণে কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে অরাজকতা সৃষ্টি করা এবং প্ররোচনা দেওয়া মানুষের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করে এবং এটি হত্যার থেকেও গুরুতর অপরাধ। বস্তুত, ইসলামী শিক্ষা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে সমাজকে শান্তি ও ভালবাসার ছায়াতলে একত্রিত করে। হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান , যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। অকারণে কাউকে সামান্যতম দুঃখ ও যাতনা দেওয়াও পাপ এবং তা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পরিশেষে আমি এই কথাটির পুনারাবৃত্তি করব যে, ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যম। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে মোটেই সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অতএব আমি আশা করি, আপনারা এবিষয়ে একমত হবেন যে, যারা ইসলামকে উগ্রবাদ এবং সহিংসতার ধর্ম রূপে উপস্থাপন করে তারা নিজেরা এক বিরাট অন্যায় কাজ করে। এই কয়েকটি কথা বলে ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা সময় বের করে আমাদের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এখন আমি দোয়া করব, যারা আমার সঙ্গে যোগ দিতে চায় দিতে পারে, অন্যথায় নিজের পদ্ধতি অনুসারে দোয়া করতে পারেন। দোয়া করে নিন।

এরপর দুইয়ের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.